দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

এবারের জয় গতবারের জয়কে ছাপিয়ে যাবে : মোদী
— পৃঃ ৬

নির্বাচনী প্রচারে ভিনদেশি : দেশের আইন ভাঙছেন তৃণমূল নেত্রী
— পৃঃ ১৩

৭১ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ২৯ এপ্রিল ২০১৯।। ১৫ বৈশাখ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

চ্যালেঞ্জার মোদী

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১৫ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৯ এপ্রিল - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সাক্ষাৎকার : এবারের জয় গতবারের জয়কে ছাপিয়ে যাবে— নরেন্দ্র মোদী ▯ ৬

বিশ্ব রাজনীতির ধারা বলছে উনিশের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত ▯ সাধন কুমাল পাল ▯ ১০

নির্বাচনী প্রচারে ভিনদেশি— দেশের আইন ভাঙছেন তৃণমূল নেত্রী ▯ সুজাত রায় ▯ ১৩

রাজনীতির অশালীন চেহারা আজম খান
▯ দেবযানী ভট্টাচার্য ▯ ১৫

ভয় পেয়েছেন মমতা— বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা তারই প্রতিফলন ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

অবসর শেষের অপেক্ষা নয়, জীবনের শুরু
▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ১৮

কবি ও রজকিনী ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩১

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'
▯ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো ▯ ৩২

কোন জাদুস্পর্শে কালীঘাট হয়ে উঠছে ব্যানার্জিপাড়া?
▯ সনাতন রায় ▯ ৩৫

রামনামে মাতোয়ারা বঙ্গভূমি ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩৭

শুধু উন্নয়ন নয়, চাই ভারতীয় সভ্যতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার
▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ৪০

শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে মানুষের ঢল ▯ ৪১

হেট ক্যাম্পেনারদের চিনে নিন ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৪৩

খোলা চিঠি : দিদি বলছেন, দিদিই প্রধানমন্ত্রী
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৪৪

এবারের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপরই দিল্লির ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকতে পারে ▯ নলিন মেহতা ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪২** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮** ▯ **উবাচ : ৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৬ মে
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৬ মে
২০১৯

কবুলনামা

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল গান্ধী স্বীকার করেছেন, চৌকিদার শ্লোগানে সুপ্রিম কোর্টের নাম ব্যবহার করা তার ঠিক হয়নি। মনে রাখা দরকার, এর আগেও তিনি অসত্য অভিযোগ করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। মিথ্যাচার এবং তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা— প্রায় অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন রাহুল গান্ধী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— রাহুলের অপরাধ স্বীকার এবং ক্ষমাপ্রার্থনা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী সন্ত্রাস ও গণতন্ত্রের সঙ্কট

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনকে উৎসব বলিয়া গণ্য করা হয়। দেশে লোকসভা নির্বাচনী উৎসব শুরু হইয়াছে। তৃতীয় চরণের ভোটদান সমাপ্ত হইয়া আজ চতুর্থ চরণ চলিতেছে। প্রথম চরণে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত কেবল অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে নির্বাচনী হিংসার খবর আসিয়াছে। দ্বিতীয় চরণে সমস্ত রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হইয়াছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও হিংসার জন্য কুখ্যাত পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এতটুকুও বদল হয় নাই। তৃতীয় চরণেও প্রাণহানি হইয়াছে। প্রথম চরণ হইতে শিক্ষা লইয়া নির্বাচন কমিশন ৮০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও শাসকদলের বাহুবলীরা ভোট লুঠ করিয়াছে। চোপড়া ও ইসলামপুরে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ভোটদানে বাধা দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হইয়াছে। এই পরিবেশ সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নহে। পূর্বে নির্বাচনী হিংসার বদনামের শিরোপা বিহার রাজ্যের মস্তকে শোভা বর্ধন করিত, এখন ইহা পশ্চিমবঙ্গের মস্তক অলংকৃত করিতেছে। নির্বাচন আসিলেই কত মা, কত স্ত্রীর বুক কাঁপিতে থাকে এই ভয়ে যে, আবার কাহার পুত্র অথবা স্বামীকে মারিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

গণতন্ত্রের উৎসবের এই পবিত্র অঙ্গনে হিংসার পরিবেশ আমদানি করিয়াছে ৪২ বৎসর পূর্বে বিদেশি মতাদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টি। তাহাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী না হইলেই তাহাকে শ্রেণীশত্রু বলিয়া হত্যা করা হইয়াছে। শান্তির নীড় গ্রামগুলির পরিবেশ তাহারা ধ্বংস করিয়াছে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভাই, আত্মীয়-স্বজনকে তাহারা গৃহবিবাদে লিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু সময় তাহাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজ্যবাসী ভাবিয়াছিল বঙ্গভূমিতে এই বার শান্তির পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া অশান্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৌজন্যে রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রী। বলা হয় তিনি নাকি কমিউনিস্ট পার্টির মেধাবী ছাত্রী। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে তিনি শ্রেণীশত্রু খতমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। গণতন্ত্রের উৎসবে তিনি রক্তের হোলি খেলিতেছেন। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর প্রাণঘাতী হামলাই এখন তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জেলায় জেলায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালাইতেছে। পুরুলিয়ার আড়সা থানার বিজেপির যুব মোর্চার সদস্য শিশুপাল সহিসকে মারিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য জুড়িয়া বিজেপির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চলিতেছে। তাহাদের অফিস পুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। রাতের অন্ধকারে তাহাদের দলীয় পতাকা খুলিয়া ফেলা হইতেছে, তাহাদের দেওয়াল লিখন মুছিয়া ফেলা হইতেছে। তৃণমূলের এক নেত্রী দলীয় কর্মীদের হিংসায় উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন এই বলিয়া যে, '৪২ এ ৪২ জিতিতে যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে।' সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের সঙ্কট চলিতেছে।

বাস্তব হইল, বহু দশক পর দেশ একজন সত্যিকারের চৌকিদার পাইয়াছে। ইহাতে চোর-ডাকাত-লুঠেরা ভয় পাইয়াছে। তাহারা হিংসা ছড়াইয়া দেশের আবহ নষ্ট করিতে তৎপর হইয়াছে। ইহা গণতন্ত্রের পক্ষে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করিয়া নিজেকে চ্যালেঞ্জার হিসাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রহিয়াছেন। কোনও ভীতি প্রদর্শন, লোভ অথবা স্বার্থ তাহাদের ভোটদানে বিরত করিতে পারিবে না। তাহারা আশা করিতেছেন, এই ভোটে গণতন্ত্র রাহুমুক্ত হইবেই। গণতন্ত্র রক্ষা পাইবেই। অশুভ শক্তি পরাজিত হইয়া শুভ শক্তির জয় হইবে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজ্যে আবার শান্তির পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে।

সুভাষিতম্

উৎসাহী বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলং।

সোৎসাহাস্যাহি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্।। (রামায়ণ)

উৎসাহই বলবান। তার চেয়ে বড়ো কোনও বল নেই। উৎসাহী পুরুষের কাছে জগতে কোনও বস্তুই দুর্লভ নয়।

এবারের জয় গতবারের জয়কে ছাপিয়ে যাবে — নরেন্দ্র মোদী

একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। স্বস্তিকায় সাক্ষাৎকারটির বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। —স.স্ব.

□ এবারের নির্বাচনে বিজেপির সম্ভাবনা কীরকম বুঝছেন? ২০১৪ সালে আপনি ছিলেন চ্যালেঞ্জার, এবারে তা নন—

মোদী : আমি নিশ্চিত এবারও আমরা মানুষের আশীর্বাদে বিপুল ভোটে জয়ী হব। আমাদের আসন আগের থেকে বাড়বে। সরকারও আরও শক্তিশালী হবে। এখনও পর্যন্ত যে সব রাজ্যে আমি গেছি সব জায়গায় মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থন পেয়েছি। প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে এনডিএ-র সদস্য দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি লড়েছিল। কিন্তু এবার লড়বে ভারতীয় জনতা।

আপনি বললেন, এবার আমি চ্যালেঞ্জার নই। কথাটা ভুল। এবারও আমি চ্যালেঞ্জার, যার লড়াই দেশের প্রতিটি ধ্বংসকামী শক্তির বিরুদ্ধে। দুর্নীতি দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে, আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই দুর্নীতিকে। পরিবারতন্ত্র ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত আলগা করে দিচ্ছে, আমার চ্যালেঞ্জ তার বিরুদ্ধেও। সন্ত্রাসবাদ আমাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে, আমি চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই সন্ত্রাসবাদকে। ...এবারের নির্বাচনে ভারতের সাধারণ মানুষও চ্যালেঞ্জার। আমাদের সঙ্গে তারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন। কারণ কংগ্রেস আবার ভারতকে দুর্নীতি এবং লুঠতরাজের অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

কংগ্রেসের ইস্তাহারে চোখ বোলালে বোঝা যায় তারা এবার নির্বাচনে জেতার জন্য লড়ছে না। দেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের কোনও উল্লেখযোগ্য চিন্তাভাবনা নেই। কংগ্রেস স্রেফ দুধের বাটিতে লেবুর রস ফেলে মজা দেখতে চায়। যার ফল সবসময়েই বিপজ্জনক।

□ ভোট বিশেষজ্ঞরা বলছেন এবারের নির্বাচনে একটাই ইস্যু, নরেন্দ্র মোদী। একজন ব্যক্তি দেশের লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে এভাবে কখনও প্রভাবিত করতে পেরেছেন বলে মনে পড়ছে না। আপনার দল তো বটেই, বিরোধীরাও আপনাকে নির্বাচনের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছেন। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

মোদী : ভারতের ১৩০ কোটি মানুষ রয়েছেন সবকিছুর কেন্দ্রে। এই নির্বাচন মোটেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের আশা, প্রত্যাশা এবং উপলব্ধি এই নির্বাচনের মূল চালিকাশক্তি। ৫৫ বছরের কংগ্রেস শাসনে আমাদের দেশের মানুষ শুধু বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। আর ৫৫ মাসের এনডিএ শাসনে দেশের মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে নতুন আশা,

নতুন বিশ্বাস। ৫৫ বছর সরকারের নীতি ছিল, ফ্যামিলি ফার্স্ট। আর ৫৫ মাসে নেশন ফার্স্ট।

আগেকার সব নির্বাচনে, প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং নীতিরূপায়ণে সরকারের ব্যর্থতা এমনই এক বোঝার মতো হয়ে দাঁড়াত যে শাসক দল তাদের নেতাকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হতো। মানুষের ক্ষোভ ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অন্য ইস্যু এনে ভোটের হাওয়া ঘোরানোর চেষ্টা করতেও দেখা গেছে। আপনাদের হয়তো মনে আছে, ২০১৪ সালে কংগ্রেস মনমোহন সিংহকে দিয়ে প্রচার করায়নি। সামনেই আসতে দেয়নি।

এটা বিজেপির কৃতিত্ব, এবারের নির্বাচন হচ্ছে মোদী সরকারের গত পাঁচ বছরের কাজের ওপর ভিত্তি করে। এটাও বিজেপির কৃতিত্ব, তারা তাদের নেতাকে সামনে রেখে লড়াই করছে। কংগ্রেসের মতো তারা নেতাকে লুকিয়ে রেখে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেনি। আমাদের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক লড়াই করার সাহস কোনও বিরোধীদলের নেই। মানুষ আমাদের 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' সরকারের কাজকর্ম দেখেছে। উপকৃত হয়েছে নানাভাবে। সেইজন্য কংগ্রেস তাদের বিদেশি পরামর্শদাতার বুদ্ধিতে ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে। কুৎসা ছড়াচ্ছে। যেহেতু তাদের মূল লক্ষ্য আমি, তাই ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী এবারের নির্বাচনে বড়ো ইস্যু।

□ আপনার সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি। আপনার কি মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার? নাকি আরেকটু সময় দিলেও প্রকল্পটি প্রত্যাশিত ফল দিতে পারবে?

মোদী : আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। গত কয়েকবছরে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করে ভারত সারা বিশ্বের কাছে নির্মাণশিল্পের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

আপনার কি মনে আছে ২০১৪ সালে ভারতে মোট ক'টা মোবাইল ফোন তৈরির কারখানা ছিল? মাত্র দুটো। আপনি কি জানেন এখন ভারতে ক'টা মোবাইল ফোন আর তার যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা আছে? ২৬৮টা। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল ফোন নির্মাণকারী দেশ। এই বিপ্লব ঘটেছে গত পাঁচ বছরে। এটা কি মেক ইন ইন্ডিয়ার সাফল্য নয়?

এ বছরের গোড়ায় আমরা বারাণসীর কারখানায় তৈরি দেশের প্রথম ডিজেল টু ইলেকট্রিক (রূপান্তরিত) ট্রেন দেখেছি। এটা এমন একটা ঘটনা যা দেখে সারা বিশ্বের তাক লেগে গেছে। বিশ্বের বহু মেট্রো প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রেলওয়ে কোচ এখন ভারতে তৈরি হয়। ভারতের প্রথম সেমি হাইস্পিড ট্রেন বন্দেভারত এক্সপ্রেসও মেক ইন ইন্ডিয়ার ফসল।

তবে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে সব থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ শিল্প। আমাদের বাহিনীর জওয়ানদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের জন্য বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখন সেই জ্যাকেট ভারতেই তৈরি হচ্ছে। জওয়ানদের যা প্রয়োজন তার সিংহভাগ ভারতে তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে হেলিকপ্টার, র‍্যাডার, ব্যালিস্টিক হেলমেট, কামান এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। আমেঠির কারখানায় তৈরি হচ্ছে বিশ্বমানের অ্যাসাল্ট রাইফেল। এখন নামদার নেতা খুব সহজেই এ.কে. ৫৬ রাইফেলের গায়ে 'মেড ইন আমেথি' কথাটা দেখতে পাবেন। এরপরেও কি বলবেন মেক ইন ইন্ডিয়া প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি?

জাপানি কোম্পানিগুলো এখন ভারতে গাড়ি তৈরি করে জাপানে রপ্তানি করছে। আরও একটা তথ্য দিই আপনাকে। ২০১৪ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৫ বিলিয়ন ডলার। গত পাঁচ বছরে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এখন সারা বিশ্ব ভারতে বিনিয়োগ করতে চায়। কারণ এখন ভারত মানে ব্যবসা করার সুযোগ, বিদেশি বিনিয়োগের নিরাপত্তা। পাঁচ বছরে মেক ইন ইন্ডিয়া এই আত্মবিশ্বাসটা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

□ বিজেপি বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে গোরক্ষা আন্দোলন চরমে পৌঁছেছে। বেড়েছে গোরক্ষকদের গুন্ডামি। কমে গেছে বাকস্বাধীনতার পরিসর। খর্ব হয়েছে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ফিরিয়ে দেবার আন্দোলন আমরা দেখেছি। সম্প্রতি ছ'শো মঞ্চশিল্পী বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন করেছেন।

মোদী : আমি প্রথম থেকে বলে এসেছি কারোরই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। যারা হিংসায় প্ররোচনা দিচ্ছেন আইন অনুযায়ী শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে বলব, আমরা

সেই আদর্শে বিশ্বাসী যা একদিন জরুরি অবস্থাকে রুখে দিয়ে গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল। আমরা বিশ্বাস করি, মতান্তর আলোচনা এবং বিতর্ক গণতন্ত্রের অঙ্গ।

পুরস্কার ফেরানো এবং ভোট না দেওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে বলি, বহু সংগঠন আছে যারা এই ধরনের প্রচারে ইন্ধন জোগায়। এইসব সংগঠন কাজ করে ভারতে কিন্তু তাদের টাকা জোগায় বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা। এদের মধ্যে যোগাযোগ দারুণ, নেটওয়ার্কও খুব শক্তিশালী। আগেকার সরকার এদের কাজকর্ম দেখেও কিছু বলেনি। ফলে দেশবিরোধী কাজ তারা চালিয়ে গেছে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় এদের থাকার কথা। কিন্তু এই আইন কোনওদিন ঠিকভাবে কাজে লাগানোই হয়নি। আমরা ক্ষমতায় এসে কাজে লাগালাম। অর্থের উৎস জানতে চাইলাম। অ্যাকাউন্টস দেখাতে বলা হলো। ভয় পেয়ে ২০,০০০ বিদেশি মদতপুষ্ট সংগঠন প্রায় রাতারাতি তাদের কাজ বন্ধ করে দিল। যেগুলো এখনও বেঁচেবর্তে আছে তারা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমাদের সরকারের নামে কুৎসা রটানোই হয়ে উঠেছে তাদের প্রধান কাজ।

□ আপনি বারবার বলেছেন, এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দেশের হিতার্থে প্রয়োজন। অথচ বিরোধীরা বলছে, এসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। দু'পক্ষের রাষ্ট্রভাবনা আলাদা বলে কি এরকম হচ্ছে? বিজেপি এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই মৌলিক ও আদর্শগত পার্থক্য ধরা পড়েছে। এই পার্থক্য কি কোনওভাবে মেটানো যায় না?

মোদী : মনে হচ্ছে কিছু লোক তাদের চোখে রঙিন কাচ লাগিয়ে রাখে। সেইজন্য দুনিয়াটা এত রঙিন হয়ে ওঠে। এন আর সি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। সুপ্রিম কোর্ট আগেকার সরকারকেও এন আর সি চালু করার কথা বলেছিল কিন্তু তারা তা করেনি। কারণ তাদের ভোটব্যাঙ্ক-রাজনীতির অন্তরায় হয়ে উঠতে পারত এনআরসি। এনআরসি নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ করার অর্থ সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, যোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা।

এনআরসি-র উদ্দেশ্য প্রতিবেশী দেশগুলিতে অত্যাচারিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা। ভারত তাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ভূমি। মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব মানুষকে আশ্রয় দেওয়া ভারতের কর্তব্য। কারণ সারা পৃথিবীতে ভারত ছাড়া এদের থাকার মতো কোনও দেশ নেই। যারা

সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন আমি তাদের কাছে জানতে চাই, প্রতিবেশী দেশে অত্যাচারিত সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত নয়? আমরা খ্রিস্টান, পার্সি, ইহুদি শিখ, বৌদ্ধ হিন্দু— প্রতিবেশী দেশের প্রতিটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়েই চিন্তিত। স্রেফ ধর্মীয় পরিচিতির কারণে এরা নিজের নিজের দেশে নির্মমভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন— হয়ে চলেছেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে এই ঘটনা ঘটছে। আমরা এর একটা সমাধানসূত্র বের করতে চাই।

□ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাষিরা তাদের উৎপাদন এবং আয়ের সমতা রক্ষিত না হওয়ায় সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ। চাষিদের এবং ক্রেতাদের স্বার্থের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় ঘটাতে চান? ফসল কম উৎপাদিত হলে লাভের গুড় অন্যের পকেটে যায়। চাষির আয় কমে। কী ভাবছেন?

মোদী : কৃষকদের কল্যাণ করার কথা আমাদের সরকার প্রথম দিন থেকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছে। আমাদের ঘোষিত নীতি, ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। আমরা যা পূরণ করতে পারব সেরকম প্রতিশ্রুতিই দিই। রোয়া থেকে শুরু করে সেচ কিংবা ফসলবিমা— কৃষিক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার আমরা করেছি। এখন আমরা কৃষকের আয় বাড়াবার কথা ভাবছি।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধির বিষয়টি যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য আমরা সহায়ক মূল্য স্থির করেছি উৎপাদন খরচের দেড়গুণ। এই বৃদ্ধির সুফল কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের আরও বেশি করে বাজার দরের সঙ্গে সহায়ক মূল্য যোগ করে সেই দামে ফসল কিনতে হবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত ইউপিএ-২ আমলে সরকার ৭ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল সহায়কমূল্যে (৩,১১৭ কোটি টাকায়) কিনেছিল। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ এনডিএ আমলে আমরা ৯৪ লক্ষ মেট্রিকটন ফসল সহায়কমূল্যে (৪৪,১৪২ কোটি টাকায়) কিনেছি। অর্থাৎ আমরা শুধু ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধিই করিনি, বাড়তি দামে দশগুণ বেশি ফসল কিনেছি।

□ জনমোহিনী রাজনীতি করেন না বলে আপনার খ্যাতি ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনা এবং পেনশন প্রকল্প কি জনমোহিনী রাজনীতির পরিচয় নয়?

মোদী : আপনি কি দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক দিক থেকে শক্তিশালী একটি সরকারের বিরুদ্ধে জনমোহিনী রাজনীতি করার অভিযোগ করছেন না? গত পাঁচ বছরে আর্থিক ঘাটতির রাশ শক্ত হাতে ধরে রেখেছি। যার প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে। সম্ভবত সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে আমাদের বিপুল প্রয়াস এবং বিনিয়োগের কথা মাথায় রেখেই আপনি আমাদের বিরুদ্ধে জনমোহিনী রাজনীতি করার অভিযোগ করছেন। কিন্তু এটা আমাদের সরকারের কৃতিত্ব। কারণ আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির কথা ভেবেছি এবং তাদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছি।

□ এবারের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে এসপি এবং বিএসপি-র মধ্যে জোট হয়েছে। বিজেপি কি তার জন্য উত্তরপ্রদেশে খারাপ ফল করবে?

মোদী : উত্তরপ্রদেশের গাড়ি এখন দুই ইঞ্জিনে টানছে। রাজ্যের মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই সচেষ্ট। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এসপি-বিএসপি-র 'মহামিলাওটি' জোট কি নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারে? এই দুই দলের কোনও রাজনৈতিক দর্শন নেই, শুধু বিভাজনের দর্শন আছে। এই সেদিনও এসপি বিএসপির বিরুদ্ধে লুঠপাট এবং দুর্নীতির অভিযোগ করেছে। আবার বিএসপি এসপির বিরুদ্ধে গুণ্ডামি ও অপশাসনের অভিযোগ করেছে। আমার মতে দু'পক্ষই ঠিক। কিন্তু দু'পক্ষেরই যেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ সেখানে জোট হয় কী করে!

□ কোনও চাপ কি অনুভব করছেন?

মোদী : দায়িত্ববোধ ছাড়া কিছুই অনুভব করছি না।

□ এমন কিছু কি আছে যা আপনি আগামী পাঁচ বছরে একটু অন্যভাবে করতে চান?

মোদী : সেটা ২৩ মে-র পর বলাই ভালো।

(সংক্ষেপিত, সৌজন্যে : টাইমস অব ইন্ডিয়া)

বিশ্বরাজনীতির ধারা বলছে উনিশের নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত

সাধন কুমার পাল

দীর্ঘ ৩০ বছর পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন বিশ্ব রাজনীতির জাতীয়তাবাদী ধারারই প্রতিফলন। বিশ্ব রাজনীতির এই ধারা বলছে, ২০১৯-এর নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যাবর্তন যে ঘটছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা যুক্ত কোনও রাষ্ট্রপ্রধানকে কেউ পুরস্কৃত করে না। নির্বাচনের মুখে রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমির শাহির তরফে নরেন্দ্র মোদীকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রদানের ঘটনা এই ধরনের ভবিষ্যদ্‌বাণীরই প্রতিফলন।

দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের উত্থানের ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও প্রেক্ষাপট অবশ্যই আছে। ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের এই উত্থানের কিছু কিছু দিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ডিজিটাল দুনিয়ায় হ্যাকিং একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। হ্যাকাররা মূলত কোনও সিকিউরিটি সিস্টেমের ত্রুটিগুলি বের করে দ্রুত ওই ত্রুটিকে নিজের কাজে লাগায়। বিভিন্ন ভাইরাস ছড়িয়ে ওই সিস্টেমকে নষ্ট করে দেয়। ওই সিস্টেমের অধীনে যে সকল সাব সিস্টেম রয়েছে সেগুলিতেও ঢুকে মূল ব্যবস্থাটিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়াস করে। এই হ্যাকিংয়ের ধারণার উদ্ভাবক কে এটা গবেষণার বিষয় হতে পারে। তবে ডিজিটাল দুনিয়ার ভিত কম্পিউটারের জন্মের অনেক আগেই বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলি তাদের নজরে আসা কোনো দেশ বা সমাজকে বাগে আনার জন্য যে পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতো সেটি আধুনিক যুগের হ্যাকারদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কোনো দেশ বা সমাজকে বাগে আনার কৌশল হিসেবে প্রথমে সেই দেশ বা সমাজের দারিদ্র্য, বেকারি, ছুয়াছুতের মতো দুর্বলতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজের কিছু মানুষকে মগজ ধোলাই করে অর্থ, যশ, মান, প্রতিপত্তির ফাঁদে ফেলে তাদের দিয়েই বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা সাম্যবাদী আন্দোলন সংগঠিত করে সেই স্থানের নিজস্ব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরপর আকর্ষণীয় মোড়কে কোনো একটি 'ইজম' চাপিয়ে দিয়ে সেই সমাজকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এসে স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। ডিজিটাল হ্যাকিং সাম্প্রতিক সময়ের সমস্যা হলেও ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক হ্যাকিংয়ের সমস্যা বহু পুরানো।

প্রথমে একটি ছোটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। গত ১২ আগস্ট ২০১৮ লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে পঞ্জাবের স্বাধীনতার জন্য গণভোটের দাবিতে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছে। ২০২০-তে ওই গণভোটের দাবি জানিয়েছে খালিস্তানি 'শিখস ফর জাস্টিস' সংগঠন। ওই সমাবেশে অংশ নেন বেশ কিছু কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, এই সংগঠন এবং আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহায়তা করছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই। নয়াদিল্লি বারবার লিখিত এবং মৌখিক অনুরোধ করা সত্ত্বেও টেরেসা মে সরকার নিষিদ্ধ করেনি সরাসরি ভারত বিরোধী এই সমাবেশটিকে। আই এস আই খালিস্তানি নেতাদের উস্কানি দিয়ে কানাডা এবং ব্রিটেনে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়কে ভারত-বিরোধিতার কাজে লাগাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রের খবর, খালিস্থানি জঙ্গিরা বিদেশে আবার একজোট হওয়ার চেষ্টা করছে। আশির দশকের মতো তারা আবার পঞ্জাবে অশান্তি তৈরি করতে পারে। গোয়েন্দাদের দাবি, আমির শাহির এক নামকরা শুটিং ক্লাবের সঙ্গে এই সমস্ত জঙ্গিদের যোগাযোগ রয়েছে। পঞ্জাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে হত্যা ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে হামলার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে ওই সমস্ত জঙ্গিকে। গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-র দাবি, খালিস্তানি জঙ্গিরা পঞ্জাবে আর এস এস নেতাদের টার্গেট করেছে। গত বছর এন আই এ কয়েকজন খালিস্তানি জঙ্গি সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। তারা লুধিয়ানার এক সঙ্ঘ কার্যকর্তা খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এন আই এ-র দাবি ওই দুজনকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল পাকিস্তান, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও সংযুক্ত আরব আমিশাহি থেকে। ওই চার্জ শিটে বলা হয় অভিযুক্ত হরমিত সিংহ, গুজন্ত সিংহ ধিঁলো পাকিস্তান, ইতালি, ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে পারে।

পশ্চিমি মহাশক্তি ও চার্চ সংগঠনগুলি যে ভারতের মতো দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ওই সমস্ত দেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের কৌশল নিয়ে চলছে এই দৃষ্টান্ত থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

২০০৮ সালে তহেলকা পত্রিকার সম্পাদক তরুণ তেজপালকে আমেরিকায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান মুসলিম কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এরপর একটি লেখায় তরুণ তেজপাল চার্চ সংগঠন, মাওবাদী গ্যাং ও ইসলামিক জেহাদি গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপের উপর আলোকপাত করেছিলেন। সে সময় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার জেহাদি দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধরত আমেরিকা ইসলামের এক নম্বর বলে শত্রু চিহ্নিত। এই পরিস্থিতিতেও আমেরিকা ও ভারতে অস্থিরতা তৈরির লক্ষ্যে বামপন্থী ও জেহাদি তৈরির কর্মসূচিতে এতটুকু ঢিলেমি আসেনি। ভারত বিরোধী জেহাদি সমর্থক আমেরিকা নিবাসী এবং স্কলারশিপের নামে আমেরিকান অর্থে লালিত পালিত বামপন্থী অঙ্গনা চাটার্জিকে ইন্ডিয়ান মুসলিম কাউন্সিলের মাধ্যমে টিপু সুলতান পুরস্কার প্রদানের ঘটনা এই বক্তব্যের পক্ষে বড়ো

প্রমাণ। এই অনুষ্ঠানে গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে মিথ্যাচার ও মিথ্যা মামলা দায়েরের অপরাধে সুপ্রিম কোর্টে সাজা প্রাপ্ত ও ২৬/১১ মুম্বই হামলায় পুলিশ নির্দোষ মুসলিম যুবকদের হেনস্থা করছে বলে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের পাশে দাঁড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত তিস্তা শীতলাবাদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার রেডিকেল মুসলমান গ্রুপ ও ভারত বিরোধী আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্যরা। মোট কথা আমেরিকা ও ইউরোপের এমন অনেক সংস্থা আছে যারা সারা বছর কোনো না কোনো ভারত বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালাতেই থাকে।

ভারতকে বিশ্বের কাছে হেয় করার ঘটনা নিরন্তর ঘটছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে শুধু ভারতেই নয় পৃথিবীর যে ১২৫-১৫০টি দেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ ছিল সেই সমস্ত দেশের প্রত্যেকটিতেই এরকম ঘটনা ঘটছে। ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে যে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেন সরকারের সর্বোচ্চ পদে বসে থেকে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে কাশ্মীর নামক অগ্নিবলয় তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রেও কর্মপরিকল্পনা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হলেও কর্ম সম্পাদন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর হাত দিয়েই হয়েছে।

২০০১ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস কনফারেন্স-এর বিষয়বস্তু ছিল রেসিজম, রেসিয়াল ডিস্ক্রিমিনেশন, জোনোফোবিয়া অ্যান্ড রিলেটেড ইনটলারেন্স। এই সম্মেলনে ভারতকে অসহিষ্ণু দেশ হিসেবে তুলে ধরার ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল। এই ডারবান পরিষদে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দলিত ও দ্রাবিড় ইস্যু তুলে ধরা হয়েছিল। ভারত সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও ভারত সম্পর্কে এই ধরনের বিষয় বছরের পর বছর ধরে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা হচ্ছে। এই ধরনের সংগঠন এখনো বিশেষ বিশেষ দেশের গায়ে কলঙ্ক লেপনের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই ধরনের বিষয় উত্থাপন করে থাকে। ২০০১ সালে এই ধরনের বিষয় উত্থাপনের আরেকটি প্রেক্ষাপট হলো এই সময় কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতাসীন। তখন কংগ্রেসের লুপ্তপ্রায় অবস্থা। নতুন সরকার যাতে নতুন ভাবনা নিয়ে এগোতে না পারে সেজন্যই ভারত সম্পর্কে এই ধরনের হেট প্রোপাগান্ডার আয়োজন। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আবার সেই অসহিষ্ণুতার ইস্যুকে খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিষয়টি এমন ভাবে তুলে ধরা হলো যে পুরস্কার ত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল।

ডারবান সম্মেলনকে সামনে রেখে দলিত ও দ্রাবিড় বিষয় দুটো আন্তর্জাতিক স্তরে এমন ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয় যেন অসহিষ্ণুতা নিপিড়নের অভিযোগ তুলে বিভিন্ন দেশের তরফে ভারতে নানা রকম নিষেধাজ্ঞার জারি করতে শুরু করে। দ্রাবিড় ইস্যুকে তুলে ধরতে তিনটি সংগঠনকে কাজে লাগানো হয়েছিল যার মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ শামিল হয়েছিল। দলিত ইস্যু তুলে ধরার জন্য লুথেরান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন জেনেভা, ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেজ, আমেরিকার ইভানজেলিক্যাল লুথেরান চার্চকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি করতে বলা হয়েছিল। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে

সেবার আড়ালে, শিক্ষা বিস্তারের আড়ালে মানবিকতার আড়ালে কীভাবে কোনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা যায় সেটা মাদার টেরিজার মিশনারিজ অব্ চ্যারিটি, লুথেরান পন্থীদের ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখলে স্পষ্ট হবে। ফলে নির্বাচন এলে ভারতের শত্রুরা নানা ভাবে যে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রয়াস করে এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত।

২০০১ এর ডারবান সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৯৮ সালে দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গঠনের মধ্য দিয়ে। এই নেটওয়ার্কের প্রয়াসে ২০০০ সালে ইন্টারন্যাশনাল দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। যার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে। ওই সময় ২০০০ সালে তামিলনাড়ুতে 'দ্রাবিড় ইস্যু দ্রাবিড় ধর্ম জাতিভেদ নষ্ট করতে পারে' শীর্ষক সাধারণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্রাবিড়ধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক এই বিষয়টি তুলে ধরাই এই ধরনের আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য। পরের বছর ডারবানে ইউনাইটেড নেশনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত 'দেশ বিদেশে জাতি বিদ্বেষ জনিত অত্যাচার' শীর্ষক আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনা সভায় 'ভারতই বিশ্বে জাতি বিদ্বেষের জননী' বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করা হয়। ২০০৪ সালে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় দাবি করা হয় ভারত দ্রাবিড়-খ্রিস্টান দেশ এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরাই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টিকর্তা। এর পরের বছর এক প্রস্তাব আনা হয় যাতে বলা হয় দ্রাবিড় ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভারতে এক স্বতন্ত্র দেশের মানুষ হিসেবে বাস করে এবং এই মানুষদের নিয়ে স্বতন্ত্র গণরাজ্য স্থাপনের জন্য সমস্ত বিশ্বজুড়ে বিদ্রোহী আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। এর জন্য বিশ্বের ৫০টিরও বেশি স্থানে বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে চরম পন্থার আশ্রয় নিতে হবে। এটা প্রমাণ করার জন্য এলটিটিইর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ আক্রমণের যোজনা বানানো হয়। শুরু হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমর্থন জুটানোর প্রয়াস। এই লড়াইয়ে কম করে এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৬ সালে পোপের ভাষণেও এই বিষয়টি উঠে আসে।

ইউরোপিয়ান মহাশক্তিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমগ্র বিশ্বকে পদানত করে শাসন ও শোষণ করেছে। এখন সেই সাম্রাজ্য নেই, তবুও ঘুর পথে হলেও সেই শাসন ও শোষণের ধারা বজায় রাখতে চাইছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মহাশক্তিগুলির এই সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার উৎস কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে হবে। বিজ্ঞান যত উন্নত হোক না কেন বিশ্বের মানব সভ্যতার ইতিহাস কিন্তু এখনো সেই রক্ষণশীল

'বংশতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের' উপর নির্ভরশীল। এই সিদ্ধান্তের মূল কথা হলো বর্তমান বিশ্বের বিস্তার জেনেসিসের নোয়ার গল্প অনুসারে তুর্কিস্থানের অরাবত পর্বত থেকে শুরু হয়েছে। বিশ্বের আশি শতাংশ বিদ্যালয়ে এই ইতিহাসই পড়ানো হচ্ছে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও তুর্কিস্থান ইউরোপের সীমান্ত লাগোয়া এশিয়াতে অবস্থিত। তবুও ইউরোপের ইতিহাস জেনেসিস, বাইবেল, মোজেসের ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। বিগত দেড়শো বছর ধরে সমগ্র বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় জগৎ ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রভাবে প্রভাবিত। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের ইতিহাস ইউরোপের ইতিহাসের মূলগত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মূলগত ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশের পক্ষেই নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়।

বিগত চারশো-পাঁচশো বছর ধরে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ এলাকায় ইউরোপিয়ান আক্রমণকারীরা শাসনের নামে লুটপাট চালিয়েছে। প্রথম ২০০-৩০০ বছর লুটপাট, অত্যাচার চালানোর পর এই অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য ইতিহাস পরিবর্তনের কাজে হাত দিয়েছে। বিশ্বের ইতিহাস যে পুস্তক থেকে শুরু বলে দাবি করা হচ্ছে সেই জেনেসিস এর নোয়ার গল্প ইউরোপের মানুষদের বিশ্বজুড়ে লুটপাট করার নৈতিক অধিকার দিয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা লিখিত এই লুটের ইতিহাস পরিবর্তনের কাজে হাত দিয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত দেশে এখনো ইউরোপের কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে বা যে সমস্ত দেশ এখনো ঔপনিবেশিক মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি সেই সমস্ত দেশ এখনো জেনেসিস ভিত্তিক ইতিহাস পরিবর্তন করে নিজস্ব ইতিহাস লেখার কথা ভাবতেই পারছে না। যেমন স্বাধীনতার সাত দশক পরও ভারত নিজস্ব ইতিহাস লেখার কথা ভেবে উঠতে পারছে না। 'আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, দক্ষিণ ভারতের অনার্যরা আফ্রিকা থেকে এসেছে' এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের উৎসও জেনেসিসের সেই গল্প। সমগ্র বিশ্বই আজ ইতিহাস থেকে জেনসিসের গল্প ছুঁড়ে ফেলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু সংগঠিত ভাবে এই প্রয়াস না হলে সাফল্য আসার সম্ভাবনা কম। কারণ ভারত-সহ বিশ্বের এক হাজারেরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিগত ১৫০-২০০ বছর ধরে ওই ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখেই নানা সংশোধন সংযোজন করেছে।

আর্য সভ্যতা ভারতেই সমৃদ্ধ হয়েছে, ভারতীয় ভাষাগুলির সৃজন ভারতেই হয়েছে এবং এতে সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এটাই ভারতীয় সিদ্ধান্ত। ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরও সংস্কৃত-সহ সমস্ত ভারতীয় ভাষার উৎপত্তি জেনেসিসের গল্পের টাওয়ার অব বাবেল থেকে হয়েছে এবং আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে এই তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিত্বও তীব্র ভাবে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু বিগত সাত দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বামীজী ও ড. আম্বেদকরকে ব্যবহার করলেও ইতিহাস পুনর্লিখনে এই মনীষীদের ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বাইবেল ও জেনেসিসকে ভিত্তি করে কীভাবে সমগ্র বিশ্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটি বুঝতে হলে সংক্ষেপে নোয়ার গল্পটি দেখে দেওয়া যেতে পারে।

একবার এক ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। ওই বন্যায় কেবলমাত্র নোয়া নামে একজন ব্যক্তিই বেঁচেছিল। যার অর্থ সমগ্র বিশ্বের মানবজাতি নোয়ার বংশধর। নোয়ার তিন পুত্র ছিল। সাম, হাম ও জেফেথ। একবার হাম ওর পিতা নোয়াকে নেশা করে উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতে দেখে হেসে ফেলে। কিন্তু সাম তার পিতাকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়। এতে নোয়া সামের ব্যবহারে খুশি হয়ে হামকে অভিশাপ দেয় যে ওর গায়ের রঙ কালো বর্ণের হবে এবং দক্ষিণ দিকে গিয়ে বসবাস করবে। হামের পুত্ররা চিরকাল সামের পুত্রদের সেবা করবে। এই গল্পের পরিণাম এটা হয়েছে যে বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশির ভাগ আজ সেমেটিক, হেমেটিক এবং জেফেথেটিক নামে তিনটি অংশে বিভক্ত। ভারতে আর্যদের সামের বংশধর হিসেবে সেমেটিক, আফ্রিকার পথ ধরে দক্ষিণ ভারতে আসা অনার্যদের হামের বংশজাত হেমেটিক বলে গণ্য করা হয়। ভারতে যাদের অনার্য, তামিল, দ্রাবিড় বলা হয় তাদের হেমেটিক বলে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের অন্য কোথাও সেমেটিক হেমেটিক বিভাজনের হদিশ পাওয়া না গেলেও তামিলনাড়ুতে মিশনারিরা দ্রাবিড়, তামিল ইস্যুতে বিভাজন রেখা সেমেটিক হেমেটিক পর্যন্ত প্রকট করে তুলেছে।

ভারতে সেমেটিক হেমেটিক থিয়োরি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আর্য নামক একটি কাল্পনিক দলকে বাইরে থেকে প্রবেশ করাতে হয়েছে। শুধু ভারত নয় বিশ্বের অনেক দেশেই সেমেটিক হেমেটিক থিয়োরি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কোনো না কোনো কাল্পনিক দলকে সেই দেশে প্রবেশ করাতে হয়েছে। যেমন আফ্রিকায় হেমেটিক, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কিছু সেমেটিক কিছু হেমেটিকের বাইরে থেকে প্রবেশ করিয়ে ইতিহাস রচিত হয়েছে। তবে আধুনিক 'Y-ক্রমোজম সিদ্ধান্ত' আর্য-অনার্য, দক্ষিণ ভারতীয়-উত্তর ভারতীয় বিভাজনের মূলে আঘাত হেনে প্রমাণ করেছে যে এদের মধ্যে জিনগত কোনো পার্থক্যই নেই। অর্থাৎ সমস্ত ভারতীয় একই পরম্পরা থেকেই বিস্তার লাভ করেছে।

আক্রমণকারীদের আক্রমণের ধরন নিয়েও সচেতন হওয়া জরুরি। সেবার আড়ালে, শিক্ষা বিস্তারের আড়ালে মানবিকতার আড়ালে কীভাবে কোনো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা যায় সেটা মাদার টেরিজার মিশনারিজ অব্ চ্যারিটি, লুথেরান পন্থীদের ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখলে স্পষ্ট হবে। ফলে নির্বাচন এলে ভারতের শত্রুরা নানা ভাবে যে জনমতকে প্রভাবিত করার প্রয়াস করে এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। এবারের নির্বাচনে তথাকথিত উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির দিকেই এই ভারতবিরোধী অপশক্তিগুলিরই সমর্থন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শুধু খ্রিস্টান মিশনারির নয়, জেহাদিদেরও আক্রমণের নানা কৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতে কোনোদিনই এই ধরনের অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই হয়নি। লড়াইয়ের পথে প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের মতো তথাকথিত সেকুলার উদারবাদী দলগুলি। ভারতের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির মতো জাতীয়তাবাদী দলের সরকারকে যে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে দেখছে ২০১৪-এর নির্বাচনে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। উনিশের নির্বাচনের ফলাফলে সেই প্রমাণের পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। ■

রাজ্য রাজনীতি

নির্বাচনী প্রচারে ভিনদেশি
দেশের আইন ভাঙছেন তৃণমূল নেত্রী

সুজাত রায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলমান প্রীতির কথা এপার বাঙ্গলা, ওপার বাঙ্গলা— দু' পারেই সুবিদিত। এমনকী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশি নাগরিক (বৈধ অথবা অবৈধ)-দের নিয়েও তাঁর সমব্যথী মানসিকতার কথাও কারও অজানা নয়। এজন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা-নেত্রীরা তাঁকে 'বেগম' বলে ঠাট্টা করতেও ছাড়েন না। দুর্মুখরা আরও এক পা এগিয়ে বলেন, তিনি নাকি দীর্ঘদিন ধরেই ফন্দি আঁটছেন, এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মিলন ঘটিয়ে একটি পৃথক দেশ গঠনের যে দেশের প্রধানা হবেন তিনিই। তাঁর দল এবং সরকার ব্যবহৃত 'বিশ্ববাংলা' লোগোটি নাকি সেই ভবিষ্যতের অখণ্ড বাঙ্গলা দেশেরই প্রতীক। আর এসব নিয়েই বাজার গরম করতে মেতে রয়েছেন কিছু অতি উৎসাহী অকালপক্ক বঙ্গসন্তান, যাঁরা বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গলাকে বাঁচাতে 'দিদি'র ওই দুঃস্বপ্ন সমান স্বপ্নটিকে বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে তার ছাপ স্পষ্ট। অভিযোগ, অনুমান কিংবা অনুভব যেমনই হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হাজার সমালোচনাতেও পিছু হঠবার পাত্রী নন, তা এবার হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল যখন দেখা গেল, শুধু বলিউড বা টলিউডের তারকাদের ভোটযুদ্ধে নামিয়েই তিনি সন্তুষ্ট নন, একেবারে খোদ বাংলাদেশ থেকে ডেকে এনেছেন তাঁর মুসলমানি ভাই ফিরদৌস আহমেদ আর গাজি নূরকে। না ভোটে প্রার্থী করেননি ঠিকই, কিন্তু ওই দুই বাংলাদেশি অভিনেতাকে খুল্লামখুল্লা নামিয়ে দিয়েছেন এ রাজ্যের ভোটের প্রচারে এবং তা দেশের সমস্ত প্রচলিত এবং সাংবিধানিক আইনকানুনকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়েই।

তৃণমূলের প্রচারে বাংলাদেশী অভিনেতা ফেরদৌস।

ফিরদৌসকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এরাজ্যে আনা হয়েছিল রায়গঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী কানহাইয়ালাল আগরওয়ালের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশে। ফিরদৌসকে আনার কারণ ছিল মূলত দুটি। প্রথমত, বাঙ্গলা সিনেমার দৌলতে ফিরদৌস এ রাজ্যে একজন জনপ্রিয় নায়ক চরিত্র। অঞ্জন চৌধুরীর পৃথিবী আমারে চায় কিংবা বাসু চ্যাটার্জির 'হঠাৎ বৃষ্টি', 'চুপিচুপি', 'টক ঝাল মিস্টি', অতি সাম্প্রতিক ছায়াছবি 'খোকাবাবু'-সহ বাঙ্গলা সিনেমায় তিনি বাঙ্গালি দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন। নির্বাচনী প্রচারে তাঁকে আনার খরচও তেমন কিছু আহামরি নয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু ফিরদৌস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই মুসলমান প্রধান রায়গঞ্জ-সহ কয়েকটি নির্বাচনী আসনে তাঁকে দিয়ে প্রচারের পরিকল্পনা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। রায়গঞ্জ ছিল মূল লক্ষ্য— কারণ রায়গঞ্জে হিন্দু মুসলমান ভোট ৫০ : ৫০ হলেও এবারে ওই কেন্দ্রে হাওয়া পুরোপুরি বিজেপির পক্ষে। এমনকী সংখ্যালঘু ভোটেরও একটা বড়ো অংশ আসবে বিজেপিতেই, শোনা যাচ্ছে এমনটাই। তার ওপর আছেন সিপিএমের বামপন্থী মুসলমান প্রার্থী মহম্মদ সেলিম এবং কংগ্রেস প্রার্থী, রায়গঞ্জের প্রিয় বউমা দীপা দাসমুন্সী। এরা থাবা বসিয়েই বসে আছেন সংখ্যালঘু ভোটে। তৃণমূলের কর্মীরা মুখ কালো করে ঘুরছেন। ভেবেছিলেন ফিরদৌসকে ঘুরিয়েই আলোয় ভরবেন রায়গঞ্জ। তারপরের গন্তব্য ছিল বসিরহাট যেখানে মুসলমান তারকা নুসরত জাহানকে প্রার্থী করেছেন 'দিদি'।

নির্বাচন কমিশন সে আশায় জল ঢেলে

মদন মিত্রের সঙ্গে প্রচারে বাংলাদেশী অভিনেতা নূর।

দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, আইনত ভারতবর্ষের ভিসা প্রদান বিধিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে—"A foreigner can't come to India and campaign for a political party।" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক স্পষ্টতই জানিয়েছে— ফিরদৌস কলকাতায় পা রেখেছিলেন বিজনেস ভিসা নিয়ে। অর্থাৎ তিনি অভিনয়ের শ্যুটিংয়ের অজুহাত দেখিয়ে ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। তাঁকে প্রচার করতে দেখা যায় হেমতাবাদ, বাঙালবাড়ি, নওদা, বিষ্ণুপুর, খাড়াইকুড়া ও চইনগর অঞ্চলে। অতএব তৎক্ষণাৎ তাঁর ভিসা বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাঁকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় এবং কলকাতার ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও) ও বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসের নির্দেশ ফিরদৌসকে ভারত ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই দিন (১৬ এপ্রিল ২০১৯) ফিরদৌস বাংলাদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তাঁর ভিসার মেয়াদ ছিল ২০২২ সাল পর্যন্ত।

এখানেই শেষ নয়, এর পরেই খবর আসে, কলকাতার জি টিভিতে অনুষ্ঠিত সিরিয়াল 'রানি রাসমণি'র রাজা রাজচন্দ্র চরিত্রাভিনেতা বাংলাদেশের বাগেরহাট নিবাসী গাজি আবদুল নূর দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক সৌগত রায়ের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার করছেন এবং তৃণমূল নেতা ও সারদা চিটফান্ড কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের গাড়িতে করে তিনি বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করছেন। তাঁর ছবি-সহ অভিযোগপত্র নির্বাচন কমিশন জমা দেওয়া হয়। তাঁকেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে বলেই জানা গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হলো, গাজি আবদুল নূর সাংবাদিকদের কাছে কবুল করে নিয়েছেন, তাঁকে নির্বাচনী প্রচারের কথা না জানিয়েই গাড়িতে তোলা হয়েছিল। মদন মিত্র তাঁকে নিয়ে কোথায় চলেছেন, তা তাঁর জানাও ছিল না। এ তো মারাত্মক অভিযোগ!

জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকরণ নিয়ে গোটা দেশের রাজনীতিই যখন সরগরম তখন স্বাভাবিকভাবেই ফিরদৌস এবং গাজি নূরকে ঘিরে বাঙ্গলার রাজনীতিও বেশ উত্তপ্ত। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় দাবি তুলেছেন, "এতকাল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা চোরাপথে ভারতে ঢুকত। এখন তৃণমূল সরাসরি তাঁদের ভারতে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের নিয়ে তৃণমূল নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে। ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে এটি একটি অশনিসংকেত। রাজ্যের বিজেপি নেতা রাহুল সিংহও দাবি করেছেন, "ফিরদৌস এবং গাজি নূরের আইনভঙ্গের ঘটনায় দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভিসার শর্ত ভঙ্গ করার জন্য এনআইএ তদন্ত করুক। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনও আপোশ করা যায় না।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও খুব পরিষ্কার ভাবেই বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এভাবে ভারতে একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারে বিদেশি তারকা আসতে পারেন? তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইন মানেন না। ভোটার কম পড়লে তিনি রোহিঙ্গাদেরও ডেকে আনতে কসুর করবেন না।"

কিন্তু দিদি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। যা বলছেন সব তাঁর আর এক মুসলমান ভাই ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য, "অকারণে জল ঘোলা করছে বিজেপি। কে কার হয়ে প্রচার করছে, তা নিয়ে কারও কিছু আসে যায় না।"

প্রশ্ন হলো, যদি আসে যায়ই না, তাহলে ফিরদৌসকে ডেকে আনা হলো কেন? কেন গাজি নূরকে কিছুই না জানিয়ে 'কিডন্যাপ' করে এনে প্রচারে নামিয়ে দেওয়া হলো? কীসের স্বার্থে? কার স্বার্থে? আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা সহজ সরল মনে হলেও, বিষয়টাকে অত সরলীকৃত করে দেখা সম্ভব নয়। কে বলতে পারে, বিজনেস ভিসা নিয়ে দুবৃত্তরা এরাজ্যের নির্বাচনে অংশ নেবে না? কে বলতে পারে, ইতিমধ্যে আইনি এবং বেআইনি পথে কত অনুপ্রবেশকারী ঢুকে গেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে, যারা এসেছেন তৃণমূলের হয়ে ভোট লুট করতে, বোমা ছুঁড়তে, গুলি করতে? তৃণমূল এবার নির্বাচনের অনেক আগেই আঁচ পেয়েছিল যে এরাজ্যের মুসলমান ভোটররা তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান বদলাচ্ছেন। তাঁরা বুঝেছেন, মুসলমান হিসেবে নয়, তাঁদের ভারতে থাকতে হলে ভারতীয় হতে হবে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ত্যাগ করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তাঁরা এটাও মেনে নিয়েছেন, ভারতের অর্থনীতি ও সমাজনীতির স্বার্থে জাতীয় নাগরিক-পঞ্জিকরণের কাজ হওয়া উচিত। তাতে তাঁদের সায় আছে ভারতীয় হিসেবেই। তৃণমূল কংগ্রেস বা কংগ্রেস এ দেশীয় মুসলমানদের নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য বিদেশি মুসলমানদের বেআইনি ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এবার এই ভয়ানক খেলা বন্ধ হওয়া দরকার।

আর তাই, দেশীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর ওপর ভরসা না করে তৃণমূল কংগ্রেস এখন বাংলাদেশি নাগরিকদের আমন্ত্রণ করে ডেকে আনছে। কারণ দলনেত্রী এখনও ঘুমঘোরে— স্বপ্ন দেখছেন, অখণ্ড বাংলা 'বিশ্ববাংলা' গড়ে উঠেছে। তিনিই রাষ্ট্রপ্রধান। বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রনায়িকা। তার জন্য আইন ভাঙতে হয় ভাঙবেন।

ভাঙছেনই তো! প্রতিনিয়তই। তিনি যদি ভারতীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতেন, তিনি যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্বাসী হতেন, যদি তিনি সত্যিই ভারতীয় হতেন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাতেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে অসম্মান করতেন না। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, সিবিআই অফিসারদের সম্মান জানাতেন, রাজ্য পুলিশ আর কেন্দ্রের পুলিশের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি, হাতাহাতি হতে দিতেন না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে নিজের দেওয়া নামে চালাতেন না। সবচেয়ে বড়ো কথা— তাঁর বাড়িতে একজন বিদেশিনীকে ভাইপো-বউ হিসেবে বসিয়ে রাখতেন না যিনি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের পিতৃপরিচয় পাল্টাতেও দ্বিধা করেন না।

ফিরদৌস ও গাজি আবদুল নূরের ঘটনা পর্বতশিখরে তুষারবিন্দুর মতোই। কেন্দ্রের নজর এড়িয়ে এমন আরও কত বেআইনি অনুপ্রবেশকারী এ রাজ্যের আনাচে কানাচে বাসা বেঁধেছে, এখনই তার তদন্ত হওয়া দরকার। এটা প্রয়োজন দেশের ও দশের নিরাপত্তার স্বার্থে, স্বাধীন ও সর্বসম্মত নির্বাচনের স্বার্থে এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলমুক্ত ভারতমাতার সম্মানে। ■

রাজনীতির অশালীন চেহারা আজম খান

দেবযানী ভট্টাচার্য

প্রাক্-নির্বাচনী রাজনীতি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। যে লড়াই দলের মতাদর্শের সঙ্গে মতাদর্শের হওয়ার কথা, সে লড়াই প্রার্থীর প্রতি ন্যক্কারজনক ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হচ্ছে। বিশেষত মহিলা প্রার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁর ব্যক্তি পরিচয়কে অতিক্রম করে লিঙ্গভিত্তিক হয়ে উঠছে। মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভাব, সেখানে কোনো মহিলাকে লিঙ্গভিত্তিক আক্রমণ শুধু শালীনতা নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিরও সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খান রামপুরের বিজেপি প্রার্থী জয়াপ্রদাকে অশ্লীল যৌন-ইঙ্গিতে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ হয়তো জয়াপ্রদাকে সতেরো বছরেও চিনতে পারেননি কিন্তু আজম খান নাকি তাঁর অন্তর্বাসের রং পর্যন্ত জেনে গিয়েছেন মাত্র ১৭ দিনে। ইঙ্গিতটি অশ্লীল শুধু নয়, আজম খানের সুপ্ত ধর্ষকামের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশও বটে। আজম খান এক্ষেত্রে এমন এক সমাজের প্রতিনিধি যে সমাজ মহিলাদের লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের বাইরে তাঁদের মনুষ্যসত্তাকে বিবেচনা করতে রাজি নয়। এবং যাঁরা নারীত্বকে লজ্জা ও সঙ্কোচের বিষয় বলে মনে করেন বলেই নারীর লিঙ্গবৈশিষ্ট্যের প্রতি কুরুচিকর ইঙ্গিত করে নারীকে সঙ্কুচিত, অবদমিত করতে চান। এরা সেই প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি বিস্মৃত হয়েছেন, যে সংস্কৃতিতে নারী সকল রূপেই পূজ্যা। কারণ নারীই প্রকৃতি। নারীই ধারণকর্ত্রী, মাতৃরূপিণী, ধরিত্রী। স্ত্রী-রূপিণী নারীর মধ্যেও মাতৃরূপিণীর বাস। নারী কেবল তার যৌনতার পুত্তলিমাত্র নয়। বরং নারীর সৃষ্টিধর্মই তাকে করে তোলে প্রকৃতিস্বরূপা, প্রাণদায়িনী।

কিন্তু আজম খান এতসব ভাবেননি।

প্রকাশ্য জনসভায় নির্দ্বিধায় জয়াপ্রদাকে অপমান করে তিনি ভেবেছেন যে এর দ্বারা বিজেপিকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু বিজেপি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের নাম। তাকে আক্রমণ করতে গেলে পাল্টা মতাদর্শ ও বিকল্প কার্যপ্রণালীর দ্বারা করতে হবে। বিজেপির একজন মহিলা প্রার্থীকে অশালীনভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে কেবল নিজের কাপুরুষতাই প্রকাশ পায় মাত্র। তবে হ্যাঁ, ভারতীয় জনতা পার্টি যেহেতু সমস্ত ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, ফলে আজম খানের এহেন আচরণে তারাও লজ্জিত বৈকি। দেশের এক নাগরিক যদি দেশজ সংস্কৃতিকে অসম্মান করে, তবে ভারতীয় জনতা পার্টি লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু বাস্তবে এ লজ্জা সর্বাধিক গ্রাস করা উচিত আজম খানকেই। কারণ আদতে ওই অশালীন মন্তব্য করে তিনি জয়াপ্রদাকেও নয়, বিজেপিকেও নয়, অপমান করেছেন গোটা সমাজকে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মহিলাকে।

আজম খানের এহেন মন্তব্য নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বুঝতে পেরেই 'দ্য ওয়ার' নামক কুখ্যাত (অর্ধসত্য ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য কুখ্যাত) সংবাদমাধ্যমের এক অতি পরিচিত লিবারেল মনোভাবাপন্ন সাংবাদিক, শ্রীমতী আরফা খানুম, আজম খানের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি। নিজে মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আজম খানের মন্তব্যের অবিমিশ্র নঞর্থকতাকেও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কিছুটা লঘু করে দেখাতে চেয়ে টুইট করেছেন। বলেছেন, আজম খান নাকি ওই মন্তব্য জয়াপ্রদার উদ্দেশ্যে নয়, বরং অমর সিংহের উদ্দেশ্যে করেছিলেন। কিন্তু আরফার এমন টুইটের জবাবে মানুষ কড়া প্রত্যুত্তর দেওয়ায় আরফা টুইইটি ডিলিট করতে বাধ্য হন। আজম খানের হয়ে আরফা খানুমের ওই মিথ্যে সাফাই কোনো কাজে আসেনি। কারণ যাঁরা আজম খানের বক্তৃতা শুনেছিলেন, তাঁরা জানেন যে আজম খানের ওই অশালীন ইঙ্গিত জয়াপ্রদার উদ্দেশ্যেই ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নিজেকে লিবারেল বলে দাবি করা আরফা খানুম কেন নিজে একজন মহিলা হয়ে আর একজন মহিলার অপমানের পরেও মহিলাটির পাশে না দাঁড়িয়ে আজম খানের পাশে অর্থাৎ অপমানকারীর পাশে দাঁড়ালেন? এ নিয়েও চলেছে জল্পনা। তবে কি এই ঘটনার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদরেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? অপমানকারীর নাম আজম খান বলেই কি আরফা খানুম নামের লিবারেল সাংবাদিক তাঁর রক্ষণার্থে টুইট করেছিলেন? অর্থাৎ নিজে মুসলমান মহিলা বলেই কি আরফা মুসলমান পুরুষটির হয়ে সাফাই দিতে চেয়েছিলেন? আরফার পক্ষপাতদুষ্টতা কি তবে জয়া'র প্রতি আজম খানের মৌখিক আক্রমণকে একটা কম্যুনাল মাত্রা দিয়ে দিল? এসব প্রশ্ন উঠেছে।

আজম খানের হয়ে আরফা খানুমের সালিশি প্রমাণ করে যে নিজেদের লিবারেল ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করা সাংবাদিককুলের সকলেই যে লিবারেল, এমন নাও হতে পারে। উপরন্তু, এক মহিলাকে কুৎসিত অপমান করার পরেও লিবারেল মহিলা সাংবাদিক আরফা খানুমের আজম খানপ্রীতি তথাকথিত বামপন্থী ফেমিনিজমের অসারতাকেও জনসমক্ষে উন্মুক্ত করে। ■

ভয় পেয়েছেন মমতা

বিজেপি-কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা তারই প্রতিফলন

অভিমন্যু গুহ

প্রতিবেদন লেখার সময় সর্বশেষ খবর দমদম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রধান কার্যালয়ে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। কেমন ছিল সেই হামলার ধরন? দুপুর নাগাদ কার্যালয়ে একা ছিলেন বিজেপির উত্তর-শহরতলী সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক চণ্ডীচরণ রায়। দুষ্কৃতীরা আচমকা বাইক চড়ে এসে ঢুকে পড়ে ওই কার্যালয়ে। শাটার নামিয়ে চণ্ডীবাবুর ওপর চলে নৃশংস মার। রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর আর গভীর ক্ষত নিয়ে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এধরনের শুষ্ক পরিসংখ্যানের কোনও শেষ নেই। এই ঘটনার দুদিন আগেই পুরুলিয়া জেলায় বিজেপি কর্মী শিশুপাল সহিসকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল গাছে। সকলেরই জানা, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ঠিক একই কায়দায় আরও দু'জন বিজেপি কর্মী ত্রিলোচন মাহাত, দুলাল মাহাতকে একইভাবে খুন করেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। গাছে দেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার গল্প দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল।

ভোটের হানাহানি বাংলায় নতুন কিছু নয়। বাম আমলেও এই ধরনের সন্ত্রাস হয়েছে, তখন ছিল শ্মশানের নীরবতা। ভোটের আগের দিন গ্রামকে গ্রাম পুরুষশূন্য করে দেওয়া হতো, বিরোধী দলের কর্মীদের গুম করা হতো, ভোটের দিন বাম-কর্মীকেই বিরোধীদের এজেন্ট সাজিয়ে বুথে বুথে বসিয়ে চলত অবাধ ছাপ্পা। সোশ্যাল মিডিয়ার অস্তিত্ব তখন ছিল না, ইলেকট্রনিক মিডিয়া অত্যন্ত দুর্বল, থাকার মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়া। হাতে গোনা দু-একটি বাদ দিয়ে অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়াই বামেদের তাঁবেদারি করতো। ফলে সিপিএমের বৈজ্ঞানিক রিগিং আর সন্ত্রাসের কাহিনি তৎকালীন সময়ে সেভাবে জানা যেত না। উদয়ন নাম্বুদিরি 'বেঙ্গলস নাইট উইথআউট এন্ড' বইতে এধরনের নানা তথ্য ঠাসা রয়েছে।

সুতরাং তৃণমূল জমানার সন্ত্রাস বাম আমলের তুলনায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু রাজনৈতিক চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসের চরিত্রেও বদল এসেছে। বাম আমলে বিরোধী বলতে সব বিরোধীকেই এক মাপকাঠিতে মাপা হতো। '৭৭ থেকে মূল বিরোধী ছিল কংগ্রেস। তবে এই দলটাতেও প্রচুর রাজনৈতিক গুণ্ডা ছিল, যারা সময়ে অসময়ে সিপিএমের হয়ে ভাড়া খেটে দিত অর্থাৎ বিরোধী আন্দোলনকে সাবোটেজ করত। পরবর্তীকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যাদের 'তরমুজ' আখ্যা দিয়েছিলেন। মজার কথা, সব জেনে বুঝেও তিনি বিরোধী নেত্রী থাকাকালীনই এই তরমুজদের দলে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং যে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসতে তাঁকে আরও দশবছর অপেক্ষা করতে হয়।

বিরোধীদের ওপর হানাহানিটা তাই বাম জমানায় কৌশলগত অঙ্গ ছিল। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর দলীয় তরমুজরা নিরাপদে ছিল। ১৯৯৯-২০০০ সালে মেদিনীপুর বা আরামবাগে বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলে, ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শ্মশানের শান্তি ফিরিয়ে এনেছিল ওই সমস্ত এলাকায় বিরোধী কর্মীদের নিকেশ করে। বাম আমলের সঙ্গে এই আমলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্রটার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, 'হাড় হিম' করা সন্ত্রাসের কোনও পরিবর্তন না হলেও ভোট মেটার পরে দলবদলের করুণ চিত্রটা আগের জমানায় অন্তত ছিল না।

শ্মশানের শান্তিতে গণতন্ত্র এভাবে প্রকাশ্যে অন্তত লাঞ্ছিত হতো না, যেটা বর্তমান সময়ে হচ্ছে। বিরোধীদের মধ্যে তরমুজ জাতীয় কোনও চরিত্র তৈরির দরকার তাই শাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেননি (যদিও কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে তাঁর ডিক্টেটরশিপের দৌলতে তৃণমূলে এখন কুমড়ো, অর্থাৎ বাইরে সবুজ ভেতরে গেরুয়া, শ্রেণীর রাজনীতিকের উদ্ভব হয়েছে)। হাজারো সন্ত্রাসেও যে বিরোধীরা ভাগ্যবলে উতরে যাচ্ছে ভোটের পর তাদের তৃণমূলি ঝান্ডা ধরিয়ে দাও, ব্যস মোটামুটি সন্ত্রাসের বিকল্প সমাধান এটাই। সিপিএমের আর যাই থাক, নীতি-আদর্শের একটা বালাই ছিল, অন্তত ওপর ওপর, তাই তৃণমূল বা কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীকে তাদের জার্সি পরতে না।

তৃণমূলের সেসব বালাই নেই, কংগ্রেসের গুন্ডারা জার্সি বদলে আগেই তাদের দলে ঢুকে পড়ে ছিল। ২০১১-র পর সিপিএমের হার্মাদরা। আর মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে নকশাল, জেহাদি ইত্যাদি দুষ্কৃতীরা। তাই সামগ্রিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস একটি দুষ্কৃতীদের আশ্রয়দাতা দলে পরিণত হয়েছে, বাম-কংগ্রেসের কোমর

দমদমে বিজেপি কার্যালয়ে হামলা। আহত বিজেপি কর্মীকে দেখতে বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য।

ভেঙে দিয়ে। অন্যদিকে ২০১৪-য় মোদী ঝড়ের পর থেকেই বাঙ্গলায় বিজেপির প্রভাব বাড়ছে। আর এস এসের সৌজন্যে বিজেপি আগাগোড়াই গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যেও 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর চরিত্র বজায় রেখেছে, তা সে পাক-নকশাল দালাল বাজারি মিডিয়া যতই তাকে কালিমালিপ্ত করবার চেষ্টা করুক না কেন।

ফলে তৃণমূল যেমন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুষ্কৃতী দলে রূপান্তরিত হয়েছে, এরাজ্যেও বিজেপিও তেমনি নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের দৌলতে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মুক্তির দিশারি হয়ে উঠেছে। তাই তৃণমূলের হামলায় যাবতীয় শিকার মূলত বিজেপি কর্মীরাই হচ্ছেন। সিপিএম-কংগ্রেসের সংগঠন নেই কেন, কেন তারা বিরোধীর আসন দখল করতে পারছে না, মমতা ব্যানার্জির এনিয়ে দীর্ঘশ্বাসের শেষ নেই। আসলে গলদটা তিনিই করে ফেলেছেন। বিরোধী রাজনীতির সর্বস্ব কুক্ষিগত করার জন্য সিপিএম-কংগ্রেস উভয় দলেই তিনি হাঁড়ির হাল করে দিয়েছেন। সিপিএম কংগ্রেসের বর্তমান অস্তিত্ব সাইনবোর্ড মাত্র। এই বিরোধী শূন্য পরিসরে মমতার একমাত্র ভয়ের কারণ বিজেপি। এই কথাটি বোঝার জন্য বিশাল রাজনীতির তাত্ত্বিক হওয়ার দরকার নেই। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে, দিল্লিতে মমতার দুর্ধর্ষ মোদী-বিরোধিতা কি কেবলই তখত দখলের তাগিদে?

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিয়াল্লিশটা আসন পেলেও যে দিল্লি বহুদূর তা সে যত অপরিণত রাজনৈতিক মস্তিষ্কই মমতার হোক না কেন, তা তিনি জানেন না, তা হতে পারে না। ফেডারেল ফ্রন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে গদি দখলের স্বপ্ন তিনি দেখতেই পারেন, কিন্তু অখিলেশের হাত ধরার আগে তার পিতৃদেব মুলায়মের দু'দুবার বিশ্বাস- ঘাতকতার ক্ষত কি এত দ্রুতই ভুলবেন মমতা? মাঝে মধ্যেই তিনি আওড়ান দিল্লির তখতের প্রতি তাঁর কোনও লোভ নেই। কথাটা যত মিথ্যেই হোক, বাস্তবতাটা মমতা নিশ্চয়ই বোঝেন? তাহলে মোদীর বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট করা, দিল্লিতে তীব্র মোদী বিরোধী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, অনেকটা বাংলায় একদা বাম-বিরোধী হিসেবে নিজেকে যেমন তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এসব কীসের তাগিদে?

বাঙ্গলায় বিজেপির প্রভাব বাড়ছে। আর এস এসের সৌজন্যে বিজেপি আগাগোড়াই গোটা দেশের সঙ্গে সঙ্গে এরাজ্যেও 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর চরিত্র বজায় রেখেছে, তা সে পাক-নকশাল দালাল বাজারি মিডিয়া যতই তাকে কালিমালিপ্ত করবার চেষ্টা করুক না কেন।

কারণ মমতা খুব ভালোভাবেই জানেন যার জোরে তিনি দিল্লির বুকে এই ধরনের মাতব্বরি করতে পারছেন, সেই পশ্চিমবঙ্গে তাঁর গদি টলটলায়মান। বাম-বিরোধিতার মরীচিকা দিয়ে উন্নয়ন বিহীন পশ্চিমবঙ্গে তাঁর রাজ্যপাট আর বজায় রাখা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজ্যেও বিকল্প হিসেবে একমাত্র বিজেপিকেই বেছে নিতে চাইছে। মমতার মুসলমান তোষণের পথেও একমাত্র কাঁটা বিজেপি। হিন্দুদের নজর ঘোরাতে তাই তিনি যতই রামনবমী করুন আর যাই করুন, এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তিনি কথা বললেও গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হিন্দুদের ভবি ভুলবে না। জেহাদি মুসলমানদের খুশি করতে তিনি মোদীর সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালে তা যে রাজ্যবাসী ভালোভাবে নেয়নি তা মমতা ভালোভাবেই জানেন।

সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে এবারে তৃণমূল ৪০ শতাংশের কম ভোট পেতে পারে, বাস্তবটা যে আরও করুণ তা মমতা জানেন। সন্ত্রাস-মুক্ত পরিবেশে ভোট হলে তৃণমূলের ৪২-এর স্বপ্নে যে সংখ্যাটা নিমেষে বদলে ২৪ হয়ে যেতে পারে, বা তারও কম এটা মমতার না বোঝার কোনও কারণ নেই। আর এই জিনিস একবার হলে ২০২১-এ বিরোধী দলের মর্যাদা পাবার মতো আসনও যে তাঁর জুটবে না, এটা তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে? তৃণমূল দলটাই এরপর থাকবে কিনা, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তো তা নিয়েও সন্দিহান।

তাই বিজেপি নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে সাধারণ বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হামলা খোদ রাজ্য-প্রশাসনের মদতপুষ্ট, কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি মমতার অসংবেদনশীল আচরণেও এরই প্রতিফলন লক্ষণীয়। আসলে মমতা ভয় পেয়েছেন, তাই ভয় কাটাতে তাঁকে ভয় দেখাতে হচ্ছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের কিছু নমুনা

- ডুয়ার্সে রূপা গাঙ্গুলির গাড়িতে হামলা, আহত দেহরক্ষী।
- পুরুলিয়ায় শিশুপাল সহিসকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া।
- জগদ্দলে দুই বিজেপি কর্মীকে মেরে হাত-মুখ ফাটিয়ে দেওয়া।
- দমদম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুর, গুরুতর আহত সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক চণ্ডীচরণ রায়।
- বাঁকুড়ায় দলীয় পতাকা লাগাতে গিয়ে একাধিকবার আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা।
- আসানসোলে আক্রান্ত বিজেপিকর্মীরা, গুরুতর জখম দুই।
- সাঁইথিয়ায় বোমাবাজি বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে।
- বর্ধমানের অন্ডালে দেওয়াল লিখতে গিয়ে গুলি বোমা চলল বিজেপির কর্মীদের ওপর।
- আরামবাগের খানাকুলে বিজেপির বুথ সভাপতি রাজকুমার ঘোড়ুইয়ের বাড়ি ভাঙচুর।
- সিউড়িতে বিজেপির সাইকেল র‍্যালিতে হামলা।
- বনগাঁয় বিজেপি কর্মীদের পিটিয়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা।
- বীরভূমের লোকপুর, দুবরাজপুরে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা।
- হাওড়ায় বিজেপি কর্মীর ওপর নির্যাতন।

এগুলি সামান্য কয়েকটি নমুনা মাত্র। এবং প্রতিবেদন প্রকাশ অবধি আরও এধরনের ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা। পুরো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হলে তৃণমূলি সন্ত্রাসের 'মহাভারত' লিখতে হয়। ■

অবসর শেষের অপেক্ষা নয়, জীবনের শুরু

প্রীতীশ তালুকদার

কর্মব্যস্ত জীবন হঠাৎ যখন কর্মহীন হয়ে পড়ে তখন মনের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতার সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। গতকাল পর্যন্ত যে প্রতিটা ঘণ্টা ব্যস্ততার ছকে বাঁধা ছিল তা আজ আর নেই।

সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠছে আর গড়-গড় করে গড়িয়ে পশ্চিমে পাড়ি দিচ্ছে। হড়-হড় করে কখন হড়কে গেছে জীবনের মূল্যবান সময়টা তা বোঝাই যায়নি। বাবা-মা গত, ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে; তাঁদের এখন ভরপুর সংসার। মেয়ে দূরে, ছেলে দূরে বা কাছে। কাছে হলেই বা কী! ছেলে, বউমা ও তাদের সন্তান মিলে একটা বৃত্ত, দূরন্ত গতির বৃত্ত। সময় নাই। তাই বড়ো একা, অপ্রয়োজনীয় একটা জীবন। স্বামী-স্ত্রী'র মতো আদর্শ বন্ধু বোধহয় আর হয় না। তাই এদের মধ্যে কেউ একে অপরকে ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেললে বাকি জনের সর্বশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাটাও হারিয়ে যায়।

গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন, কর্মহীনতা অসম্ভব। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত কর্ম থেকে দুরে থাকা সম্ভব নয়। তুমি কিছু করছ না! কে বলেছে করছ না? তুমি দেখছ, শুনছ, কথা বলছ, হাঁটছ, বসে আছো, শুয়ে আছো, ঘুমাচ্ছ। তোমার হৃদপিণ্ড পরিশ্রুত রক্ত সরবরাহে ব্যস্ত, তোমার ফুসফুস অক্সিজেন আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে ব্যস্ত, কিডনি জল নিয়ে ব্যস্ত, বিভিন্ন গ্লান্ড জটিল শারীরবৃত্তীয় কর্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত, পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদন্ত্র ব্যস্ত, প্রতিটা শিরা-উপশিরা প্রতিটা কোষ ব্যস্ত, তোমার মন, চিন্তা ও চেতনা ব্যস্ত। বয়স ঊনষাট বছর তিনশো চৌষট্টি দিন, তুমি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্মবীর; বয়স ঊনষাট বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, ঝপ্ করে তুমি অযোগ্য, কর্মহীন, অপ্রয়োজনীয়। হঠাৎ করে কীভাবে তুমি অপ্রয়োজনীয় অযোগ্য হয়ে গেলে! জীবনের বাকিটা কি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা, তার জন্য টাইম পাস? আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর বয়স আটষট্টি। বর্তমান রাষ্ট্রপতি কোবিন্দজীর বয়স তিয়াত্তর। চরম ব্যস্ত তারা। অবসর প্রাপ্তরা এক অদ্ভুত জীবন নিয়ে শুধু টাইম পাস করছেন না, সমাজকে বঞ্চিতও করছেন।

যে বিশাল সংখ্যক অবসর প্রাপ্তরা মন ও শরীর ঠিক রাখতে রোজ গন্তব্যহীন হয়ে হাঁটছেন, চায়ের দোকানে বসে সমাজ, রাজনীতি ও দেশের অবস্থার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করছেন, পার্কে বসে পরিতাপ করছেন তাঁদের শরীর ও মন আসলে কিন্তু অকেজো হয়ে যায়নি, যায় না। সঙ্গে তাঁদের আছে বিদ্যা, জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতা, ভরপুর জ্ঞান, পোড় খাওয়া চোখ। এসব ব্যবহার করে তাঁরা একই সঙ্গে নিজের জীবনকে সুন্দর মুখর করে রাখতে পারেন আর সমাজকেও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

শরীর সুস্থ রাখতে বা রোগের সঙ্গে লড়তে রাস্তায় লক্ষ্যহীন হয়ে হাঁটছেন? আপনার মনে তখন ক্রিয়া চলছে। আপনার শরীরে রোগ আছে, শরীরের জন্যেই আপনাকে হাঁটতে হচ্ছে। শূন্য কাজে পরিশ্রম করে আপনি বাড়ি ফিরলেন, আপনার মনের খোরাক পেলেন কি যা আপনার মনটাকে তাজা রাখে? মনই শরীরের চাবিকাঠি। বাড়িতে যেটুকু জায়গা আছে বা ছাদে টব রেখে সেখানে পরিশ্রম করুন। দুটো ফুলের চারা, দুটো বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কাচারা লাগান, রোজ পরিচর্যা করুন। শরীর ঠিক রাখার পরিশ্রম এতেই হবে, সঙ্গে বাড়তি পাবেন অনাবিল আনন্দ। যখন চারা অঙ্কুরিত হবে তখন দেখবেন এক অদ্ভুত খুশিতে আপনার মন ভরে গেছে। একটু একটু মাটি খুঁড়ে দেবেন, জল দেবেন আর দেখবেন আপনার সৃষ্টি কেমন শাখা মেলে সবুজ পাতা, ফুল ও ফলে ভরে উঠছে। আপনাকে তারা সব সময় আকর্ষণ করবে আর আপনি হবেন মুগ্ধ, তৃপ্ত। বন্ধুদের মাঝে সে গল্প করে দেখবেন তার স্বাদ কত মধুর।

আপনি পাড়ার মন্দিরের কাজে নিজে থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। অন্তত সময় করে নিয়মিত একটা আলোচনা চক্র চালাতে পারেন। রুটিন করে প্রতিদিন বিকেলে বেরিয়ে কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করে আপনার কাজের সঙ্গে যুক্ত করুন। নিয়মিত বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন মানুষের কাছে বার বার যাওয়া, খোঁজখবর নেওয়ার ফলে সকলের কাছে আপনি বিশেষ হয়ে উঠেছেন। দেখবেন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আনন্দ-উৎসবে আপনাকে তাঁরা কাছে চাইছে, আপন ভাবছে।

আপনার অনেক অভিজ্ঞতা। কলম ধরুন, বন্ধু, তরুণ, যুবকদের উৎসাহ দিন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ফোটোগ্রাফি, ছোটোদের আঁকা ছবি নিয়ে মাসিক, ত্রৈমাসিক, যান্মাসিক পত্রিকা বের করুন। অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে কল্পনার মিশেলে নাটক, শ্রুতিনাটক লিখুন, পড়ে শোনান, সংশোধন করুন, রিহার্সাল করুন, মঞ্চস্থ করুন। ডাক আসতে থাকবে। ব্যস্ততা বাড়বে, নিজের আমিকে খুঁজে পাবেন।

রামনবমী মাহাত্ম্য

রামকে নিয়ে টানাটানি চলছিল বেশ কয়েক বছর ধরেই। উনিশের লোকসভা ভোটের ভরা বাজারে রাম মাহাত্ম্য তাই অন্য মাত্রা পেয়েছে। কয়েক বছর আগেও রামনবমী ঘিরে এত শোরগোল ছিল না। এখন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা তুমুল উৎসাহে রামপুজো করছেন। রামের ওপর এতদিন বিশেষ রাগ ছিল। সেজন্য এ রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একসময় বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলতেন--- 'রামভক্ত হনুমান'-এর দল। তৃণমূলের এক মন্ত্রী সিবিআই-এর সৌজন্যে জেলে গিয়ে হনুমান ভক্ত হয়ে গেলেন। সেখানে তিনি হনুমান চালিশা পাঠ না করে জলস্পর্শ করতেন না এবং এখনও হনুমান পদে দারুণ মতি। শুধু তৃণমূল নয়, হাওড়ার কংগ্রেস প্রার্থীও অস্ত্রপূজা করেছেন।

কয়েকদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বেরোতে। এই শোভাযাত্রাগুলিতে প্রচুর মানুষ 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। শোভাযাত্রায় রাম-সীতা-লক্ষ্মণের মূর্তি-সহ বেশ কয়েকটি সুসজ্জিত ট্যাবলোও দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে ভালো ফল হতে পারে গেরুয়া শিবিরের। আর হিন্দু আবেগকে উস্কে দিয়ে তার প্রতিফলন ইভিএমে ফেলতে কসুর করছে না গেরুয়া শিবির।

অন্যদিকে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের 'ভোটামৃত' মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মমতাজ সঙ্ঘমিতা রামনামের নামাবলি গায়ে দিয়ে রামনবমীর উৎসবে শামিল হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার কার্যকরি সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়। এখানে 'ভোটামৃত' সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া দরকার।

দাদাঠাকুর লিখেছেন— ''ভোট দিয়ে যা.../ আয় ভোটার আয়/ মাছ কুটলে মুড়ো দিন,/ গান বিয়োলে দুধ দিব,/ দুধ খেতে বাটি দিব,/চাল দিলে ভাত দিব,/মিটিংয়ে যাব না,/ অবসর পাব না,/কোনো কাজে লাগবো না, / যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা''। আমরা জানি এ হলো শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের 'ভোটামৃত'। যা গেয়ে এক সময় জঙ্গিপুর পুরভোটের প্রচার করা হয়েছিল জনৈক কার্তিক চন্দ্র সাহার পক্ষে। লোকসভার ভোটের প্রাক্কালে আজকের ভোট-ভিখারিদের সম্পর্কেও তাঁর সেই ভোটের গান সমান প্রাসঙ্গিক।

রামনবমী হিন্দুদের পবিত্র উৎসব। বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে বিজেপি এই উৎসব এতদিন একচেটিয়াভাবে পালন করত। কিন্তু ভগবান রাম ছাড়া যে কারুরই গতি নেই তা এবারের লোকসভার ভোট প্রচারে দেখা যাচ্ছে। বিজেপি বিরোধী অর্থাৎ স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষীরাও তা অনেক দেরিতে বুঝতে পেরে রামনবমী পালন করছেন।

পিছিয়ে নেই সিপিএম দলের লোকেরাও। কয়েকমাস আগে রাজ্যের সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন— 'আমরা কেরলে রামনাম, রামায়ণ পাঠ শুরু করেছি। আগামী মাসে সেখানে সাতদিন ধরে রামসপ্তাহ পালন করা হবে।'

এর আগে আমরা দেখেছি যে-কোনো ভোটের আগে থেকে ধর্মনিরপেক্ষীরা মসজিদ-মাজারে গিয়ে চাদর চড়াতেন, ইমাম-মোয়াজ্জেম, পিরসাহেবদের পদ প্রক্ষালন সহ অনেক মহতী কার্যে লিপ্ত হতেন। কেউ আবার হিজাব পরে, রোজা না রেখেই (একথা অবশ্য দুষ্ট লোকেরা বলেন) ঈদের সমাজ আদায় করতে বসতেন। আর ঠিকমত ক্যামেরায় ছবি উঠছে কিনা তা পিটপিট করে দেখতেন। রোজার মাসে তো ধর্মনিরপেক্ষীরা যেভাবে ইফতার পার্টি দিতেন বা ইফতার পার্টিতে যোগ দিতেন তা দেখে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানও লজ্জা অনুভব করতেন। এখন অবশ্য শ্রীরামের প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষীদের ওই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ভাটা পড়েছে।

তবে যে যাই বলুক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক সময় ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যেমন

দুষ্টকে দমন করতেন তেমনি শিষ্টকেও পালন করতেন। সেই মহানুভব ভগবান শ্রীরামের শরণাপন্ন যদি কেউ হতে চান তাতে দোষের কিছু নেই। আর তাই যারা এতদিন ধরে দয়ালু আল্লার দোয়া মেঙ্গে এসেছেন এখন তারাই আল্লা ছেড়ে শ্রীরামপদে মাথা ঠুকেছেন। এ যেন ভোট বৈতরণী পারের জন্য গলদেশে ক্যান্সারের যন্ত্রণা অনুভব করেও রামনাম করছেন। তাদের জন্য আমরা করুণা প্রকাশ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি! বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, এ সবই সেই রামলালাকা লীলা, রামসীতা কির্‌পা।

—মণীন্দ্রনাথ সাহা,
গাজোল, মালদহ।

কবিতা লিখে কোটি কোটি টাকা!

তাঁর 'কবিতা'র সৃষ্টিশীলতা, তাঁর কাব্যপ্রতিভা, তাঁর ছবি আঁকার দক্ষতা, মুনশিয়ানা সব কিছুতেই সারা পৃথিবীর বাঙ্গালি সমাজ মুগ্ধ। আর পশ্চিমবঙ্গের জনতা যাঁরা সর্বদা তার কবিতার বিচ্ছুরণে মোহাবিষ্ট থাকেন, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা বাকরুদ্ধ অথবা তাজ্জবও বনে যান। যেমন একটা কবিতার কথা ধরা যাক, 'ভিক্ষা নয়, চাইছি ঋণ, রায়গঞ্জটা এবার দিন'— দেখুন তো কী তার ছন্দ, কী তার শব্দচয়ন, কী তার গভীরতা, কী তার নান্দনিকতা, কী অসাধারণ বাচনিক ভঙ্গি! আর এই সব কবিতাগুলোকেই তো সর্বজনীন করে তুলছে আজকের বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলো। শুধু কি এই একটা কবিতা, হাজার হাজার কবিতা থরে থরে সাজানো আছে তাঁর মস্তিষ্কে, তাঁর আঙুলের ফাঁকে। শুধু কলমটা আঙুলে লাগলেই হলো! খালি কবিতা বেরোচ্ছে। উনি যেখানে যাচ্ছেন যে দৌড়েই

যান আর হেলিকপ্টারেই যান, দাঁড়ালেই বসন্তে গাছের শুকনো পাতা ঝরার মতোই তাঁর কবিতা ঝরে ঝরে পড়ে। সে কবিতার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। তাছাড়া কলমেরও দরকার হয় না তাঁর কবিতা লিখতে— তাঁর মুখ আছে, হাত আছে, আর আছে কয়েকটা আঙুল। আঙুল নাড়ানো, আর ঘুঁষি পাকানো হাত যা তিনি ক্রমাগত ছুঁড়তে থাকেন আকাশের দিকে সেখানেও কবিতার ছন্দ ফুটে ওঠে। আমবাঙ্গালির কাছে যেটা লজ্জার, শরমের, অসম্মানের ও অশ্লীলতার সেটাই তো তাঁর কাছে কবিতা। তিনি যেভাবে আঙুলগুলো নাড়াতে থাকেন এবং নাড়াতেই থাকেন সেই আঙুল নাড়ানো দেখে কি মনে হয় না সেগুলোও এক একটা কবিতা!

বাঙ্গালি রাজনীতি দেখেছে, রাজনীতি চর্চাও করেছে। রাজনীতির চর্চা করতে করতে কাব্য, নাটক, সংস্কৃতি সবেরই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বক্তৃতা মঞ্চে উঠে আঙুল নাড়াতে নাড়াতে এমন কবিতা সৃষ্টি বাঙ্গালি কখনও দেখেনি— যেমন একটা কবিতা, '২০১৯, বিজেপি ফিনিশ'। তার ইংরেজিরও কত জ্ঞান— 'ফিনিশ' এর ব্যবহার দেখুন; ভার্ব বা পাস্ট পার্টিসিপলের কী অসাধারণ প্রয়োগ। আবার ভার্বের কথা আসছে! কোনোদিনই বা তিনি ভার্ব বা গ্রামার মেনে চলেছেন, কী দরকার তার ব্যাকরণ মানার, আর তাছাড়া আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়েই যদি কবিতা হয় তাহলে ব্যাকরণ মানারই বা দায় কোথায়! এই যে তিনি একবিংশ শতকের এক সেরা পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য প্রবীণ আমলাদের এবং জেলার এস পি'দের বক্তৃতা মঞ্চে বেমালুম নাম ধরে ডাকতে থাকেন তার মধ্যেও তো এক কবিতারই ছন্দ প্রকাশ পায়! আঙুল নাড়ানোটাই যেখানে শিল্প সেখানে আবার ব্যাকরণের কথা! রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই অফিসারেরা যখন গেলেন, আঙুল নাড়ানো নেত্রী তখন দৌড় মারলেন তার প্রাণ ভোঁমরাকে বাঁচাতে। মুখ্যমন্ত্রী দৌড়াচ্ছেন পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে, আবার তিনি বলছেন, প্রাণ থাকতে আমি রাজীবের গায়ে আঁচড় কাটতে দেব না! এগুলো তো সবই প্রশাসনের ব্যাকরণ মানার নমুনা! উনি যে ডক্টরেট ডিগ্রিটা পেয়েছিলেন সেটাও তো ব্যাকরণ মেনেই হয়েছিল! আর এই ব্যাকরণ মানার ফলশ্রুতিতে কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন, আরও একটা কবিতা, 'ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার'— কত বড়ো কবিতা ভাবুন তো! এইসব কবিতা লিখেই তো তিনি কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে চলেছেন।

—শুভ্র সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

ওরা কি বেঁচে আছে?

সংবাদে প্রকাশ ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে ৫৪ জন ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের হাতে বন্দি হয়ে লাহোরের কোটলাসপত জেলে রয়েছেন। সে সময় ভারতের হাতে প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা বন্দি ছিল। তখনই ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই ৫৪ জন ভারতীয় সেনাকে মুক্ত করতে পারতেন, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা করেননি, পাকিস্তান তখন কোণঠাসা। যে কোনো প্রস্তাব পাকিস্তান মেনে নিতে বাধ্য হতো।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেও ভারতীয় সেনাদের মুক্ত করা সম্ভব হতো। যে ভাবে সেনা পাইলট অভিনন্দনকে মুক্ত করা হয়েছে। তৎকালীন ইন্দিরা সরকার তা না করে নিখোঁজ 'তকমা' দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়েছিল। এরপর শতদ্রু ও সিন্ধু দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কোনো সরকারই ৫৪ জন বন্দি সেনাদের মুক্ত করার ব্যাপারে প্রচেষ্টাও করেননি। কেন? একজন ভারতীয়ও যদি পাক জেলে বন্দি থাকেন, মুক্ত করার দায় ভারত সরকারের। পাকিস্তানের জেলে ভারতীয় বন্দিদের ওপর জঘন্য অত্যাচার চালানো হয়। এত বৎসর পর ওদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যেমন কুলভূষণের ক্ষেত্রে হয়েছে, ভারত সরকার তাঁকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানোর ব্যবস্থা করছে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার চলছে। কে জানে কুলভূষণের ভাগ্যে কী আছে?

১৯৭১ সালে দেশের জন্য ওই ৫৪ জন সেনা লড়াই করেছিল। কিন্তু সরকার কেন তার দায়িত্ব পালন করেনি? সে সময় ইন্দিরা গান্ধীর উচিত ছিল, ওই ৫৪ জন সেনা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত পাক সেনাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। তাহলেই পাকিস্তান বাধ্য হতো তাঁদের ফেরত দিতে। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী দেশ, ওরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হয়। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ভারত সরকারের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ভাবে ৫৪ জন বন্দিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়নি কেন? অভিনন্দনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যেভাবে কূটনৈতিক চাপে কোণঠাসা করে তাঁকে সসম্মানে ভারতে ফেরত আনতে সফল হয়েছেন।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

মমতার বায়োপিক

বায়োপিক কথাটির সঙ্গে এখন অনেকেই পরিচিত। কোনও ব্যক্তির জীবন অবলম্বন করে যখন সিনেমা তৈরি হয় তাকে বায়োপিক বলে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন অবলম্বন করে একটি ছবি তৈরি হয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, ছবিটি মুক্তি পেলে বলতে হয়, যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবন- নির্ভর ছবির মুক্তি এখন বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'বাঘিনী' মুক্তি প্রতীক্ষায়। বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অভিযোগ করলেও কমিশন এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি। কবে নেয় বা আদৌ নেয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

—সুনন্দা দত্ত,
বাঘাযতীন, কলকাতা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মা-মেয়ে একসঙ্গে পেলেন ডক্টরেট সম্মান

অঙ্গনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ছাপ্পান্ন বছরের মা ও আটাশ বছরের মেয়েকে একসঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি দিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নিসন্দেহে এটি একটি বিরল ঘটনা।

প্রথাগত শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার ৩৪ বছর পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট সম্মান পেলেন মা মালা দত্ত। জানা গেছে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম মা ও মেয়েকে একসঙ্গে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হল। বিষয় হলো, গত বছরই মা ও মেয়ে একই সঙ্গে এই ডিগ্রি গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের যে দিনে তাঁদের ডক্টরেট সম্মান গ্রহণ করার কথা ছিল তার আগের দিন শ্রেয়ার বিয়ের দিন ধার্য ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন, যাতে পরবর্তী বছরের সমাবর্তনে তাদের পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গত বছর সমাবর্তন ছিল ১৯ নভেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আরও এক বছর মা ও মেয়েকে অপেক্ষা না করিয়ে গত ১৫ মার্চ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের ডিগ্রি প্রদান করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস অফিসার হিসেবে কাজ করেন মালা দত্ত। নিজের মেয়ে শ্রেয়া মিশ্রের সঙ্গেই তিনি পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন। মালা দেবী জানান, ১৯৮৫ সালে সালে দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেন তিনি। তখন থেকেই তীব্র ইচ্ছা ছিল পিএইচডি করার। কিন্তু নানা কারণে সে ভাবে সক্রিয় লেখাপড়ার জগতে থাকতে পারেননি। এর মাঝখানে পেড়িয়ে গেছে অনেকগুলি বছর। চাকরি আর সাংসারিক টানাপোড়েনে পিএইচডি করার ইচ্ছেটাকে তার কার্যত শিকেয় তুলে রাখতে হয়। তবে ইচ্ছেটা যে পুরোদস্তুর মিলিয়ে যায়নি, মালা দেবী সেটা টের পান বছর কয়েক আগে। যখন জানতে পারলেন তার ছোট মেয়ে শ্রেয়া পিএইচডি শুরু করছে। এরপরেই তিনি যাকে বলে কোমর বেঁধে বইপত্র নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েন। মেয়ের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করে নেন। পড়ুয়া জীবন শেষ করার দীর্ঘ ৩৪ বছর পরে পিএইচডি করতে শুরু করেন মালা দেবী। তাঁর কথায়, 'আমার ছোট মেয়ে শ্রেয়া তখন দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা দিচ্ছে, পিএইচডি করার পরিকল্পনাটা তখনই মাথাচাড়া দেয়। এরপর শ্রেয়ার কলেজ পর্ব শেষ হয়। তখন সিদ্ধান্ত নিই আর নয়, এবার পিএইচডি শুরু করতেই হবে। ফিন্যান্সে পিএইচডি করার জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি। পড়াশোনার জন্য চাকরি থেকে স্টাডি লিভও পেয়ে যাই। মা ও মেয়েতে মিলে জোরকদমে শুরু হয় পড়াশোনা।' সেখান থেকে পাঁচ বছরের অধ্যাবসায়। আজ মা ও মেয়ে এক সঙ্গে পেয়েছেন পিএইচডি ডিগ্রি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গত বছর মা ও মেয়ে একই সঙ্গে থিসিস পেপার জমা দেন। মৌখিক পরীক্ষাও দেন এক সঙ্গে।

মালা দেবী জানিয়েছেন, মেয়ের বয়সি পড়ুয়াদের সঙ্গে পড়াশোনা করাটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু যতদিন এগিয়েছে ততই তিনি বিষয়টাকে উপভোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, মেয়ের এক বছর আগেই তিনি শেষ করেন পিএইচডি। গত বছরের নভেম্বর মাসে তার সমাবর্তন ছিল। মালা দেবী সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিতে যাননি। পরের বছর মেয়ের সঙ্গে একই মঞ্চে ডিগ্রি নেবেন বলে অপেক্ষা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সেকথা জানিয়েছিলেন। মালা দত্তের মেয়ে শ্রেয়া মিশ্র পড়াশোনা শেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অফিসার হিসেবে যোগ দেন। স্নাতকোত্তর শেষে দুবছর বাদে সাইকোলজিতে পিএইচডির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেন।

শ্রেয়া মিশ্র জানান, 'পিএইচডির জন্য আবেদন করার কথা বাড়িতে জানানোর পরেই মা-ও এগিয়ে আসে। মায়ের ইচ্ছেটা দেখে আমি খুব খুশি হই। সেদিনই ঠিক করি মা ও আমি পিএইচডি করব এক সঙ্গে এবং শেষও করব এক সঙ্গে। এমনটা করতে পারলে দেশের সামনে তো বটেই, বিশ্বের সামনে আমরা একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারব। আজ আমাদের সেই স্বপ্ন সফল হলো।'

শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো। মা ও মেয়ে এক সঙ্গে শেষ করলেন পিএইচডি এবং একই সঙ্গে পেলেন ডক্টরেট সম্মান। এখন দুজনেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকী বিদেশ থেকেও প্রশংসা আর অভিনন্দনে ভাসছেন। নারী সমাজের কাছে নিসন্দেহে এটি অনুপ্রেরণার। ■

গরমে কীভাবে সুস্থ থাকবেন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বৈশাখের গরমে হাঁস-ফাঁস, তার উপর নানা রোগের উপদ্রব, আর বৃষ্টির জন্য মানুষের হা-পিত্যেশ। এ সময় সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ও তাপে শরীরের জল বাইরে বেরিয়ে আসে ঘাম হয়ে। যত বেশি ঘাম, তত বেশি শরীরে জল ও লবণের ঘাটতি দেখা যায়। পাচনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, হজম নিয়ে শুরু হয় বেজায় গণ্ডগোল। সানস্ট্রোক, লু এসবেরও ভয় থাকে। খাবার ব্যাপারে এই সময় সচেতন না হলে মুশকিল। শিশুরাও এই সময় বড্ড বেশি ভোগে, ওদের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি সুস্থ রাখার জন্য নিয়ম মেনে চলাও প্রয়োজন।

হার্টের অসুখ : হার্টের রোগীদের গরমকালে খুব অসুবিধা হয়। বেশি ঘামের ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম বেরিয়ে যায়। ফলে দুর্বলতা আসে এবং কাজেকর্মেও আসে অলসতা। প্রচণ্ড গরমে হার্ট ব্লকেরও সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সানস্ট্রোক থেকে হার্ট ফেলিওর হতেই পারে। তাই গরমের সময় হার্টের রোগীদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন, প্রচুর পরিমাণে জলপান করতে হবে। মরসুমি ফল খেতে হবে। অতিরিক্ত রোদে বের হওয়া চলবে না, রাস্তায় বেরোলে ছাতা ব্যবহার করতে হবে, সুতির হালকা পোশাক পরতে হবে। চেষ্টা করতে হবে ঠাণ্ডা জায়গায় থাকার। কারণ, রোদের তাপ হার্টের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে।

চোখের রোগ : এসময় প্রচণ্ড তাপে চোখের নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। চোখ লাল হয়, জ্বালা করে, দেখতে অসুবিধা হয়। এছাড়া চোখে অ্যালার্জিও হতে পারে। সাবধান না হলে চোখের ইনফেকশন এবং কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে। এই সময় চোখকে সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানতে হবে। যেমন— বাইরে থেকে ঘুরে এলে পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। চোখে হাত লাগানো ঠিক নয়। যদি চোখে হাত দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবে চোখে হাত দেওয়া যেতে পারে। রোদে বের হলে সানগ্লাস ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা যেন ভালো মানের হয়। রোদে বের হলে ছাতা ব্যবহার করুন।

নাকের অসুখ : গরমে নাকের যে অসুখ হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো নাক দিয়ে রক্ত পড়া এবং সাইনুসাইটিস। গরমকালে নাক দিয়ে রক্ত পড়ার কারণ হলো নাকের ভিতরটা অতিরিক্ত গরমে শুকিয়ে যায়। ফলে রক্তপাত হয়ে থাকে। যদি গরমের কারণে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তাহলে নাকের ভিতরটা ভিজে রাখতে হবে। এর জন্য নাকের ভিতর কোনও অয়েন্টমেন্ট বা ভেসলিন দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। এতেও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। খুব গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে বা এসি থেকে বেরিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে এসিতে ঢুকলে সাইনুসাইটিস হতে পারে। এতে অনেক সময় মাথাব্যথা করে, গা ব্যথা হয়। নাক বন্ধ হয়ে যায়। নাক বন্ধ হলে জোরে নাক ঝাড়া বা নাক খোঁচাখুঁচি করলে আরও ক্ষতি হবে।

পেটের সমস্যা : গরমকালে পেটের নানা ধরনের অসুখ দেখা যায়। এর মধ্যে আন্ত্রিক এবং ডায়েরিয়া অন্যতম। অতিরিক্ত গরমে সাধারণ পেটের অসুখও হতে পারে। ডায়েরিয়া কয়েক ধরনের হয়—

নার্ভাস ডায়েরিয়া— অনেক সময় ভয়, শোক, দুঃসংবাদ শুনে বা দুশ্চিন্তা থেকে পেটে চাপ পড়ে, পেটে মোচড় দিয়ে পাতলা পায়খানা হয়।

ব্যাকটেরিয়াল ডায়েরিয়া— বিষাক্ত, বাসি বা পচা মাছ-মাংস বা খাবার খেয়ে বা বাজারের খোলা, কাটা ফলমূল বা জল পান করলে ঘন ঘন জলের মতো পায়খানা বা বমি হতে পারে।

অ্যালার্জিক ডায়েরিয়া— অনেক সময় ডিম, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, আইসক্রিম খাওয়ার ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে পেট কনকনিয়ে পায়খানা হয়।

অ্যাকিউট সামার ডায়েরিয়া— প্রচণ্ড গরম থেকে এসে হঠাৎ ঠাণ্ডা কিছু খেলে ডায়েরিয়া হতে পারে। এছাড়া ঋতু পরিবর্তনের সময় গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরমের জন্য অনেক সময় জ্বর, পেটের গণ্ডগোল দেখা দেয়। আন্ত্রিকের সমস্যায় সাধারণত পেট ব্যথা করে। বারে বারে (প্রায় ৩০-৪০ বার পর্যন্ত) জলের মতো পাতলা পায়খানা হতে পারে। প্রথমে অল্প জ্বর এবং বমি, পরে জ্বর প্রায় ১০৩-১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়।

ডায়েরিয়া বা আন্ত্রিকে শরীরে জলাভাব দেখা দেয়। তাই প্রথমে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। রোগীকে ওআরএস খাওয়াতে হবে। প্রাথমিকে উপোস করতে পারলে ভালো, তবে তা রোগীর শরীরের উপর নির্ভর করবে।

খিঁচ ধরা : গরমকালে যারা কঠিন পরিশ্রম করে আর প্রচুর ঘামে তাদের হাতে-পায়ে বা পেটে কখনও কখনও খিঁচ ধরে। শরীরে নুনের অভাবে এরকম হয়। এক্ষেত্রে ওআরএস অথবা এক লিটার ফোটানো জলে ১ চা-চামচ নুন গুলে পান করতে হবে। একটু চিনি আর লেবুর রস দেওয়া যেতে পারে।

যোগাযোগ : ৯৮৩০৫০২৫৪৩

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
বীরভূম কেন্দ্র

বীরভূমে বিজেপির লড়াকু মুখ দুধকুমার মণ্ডল

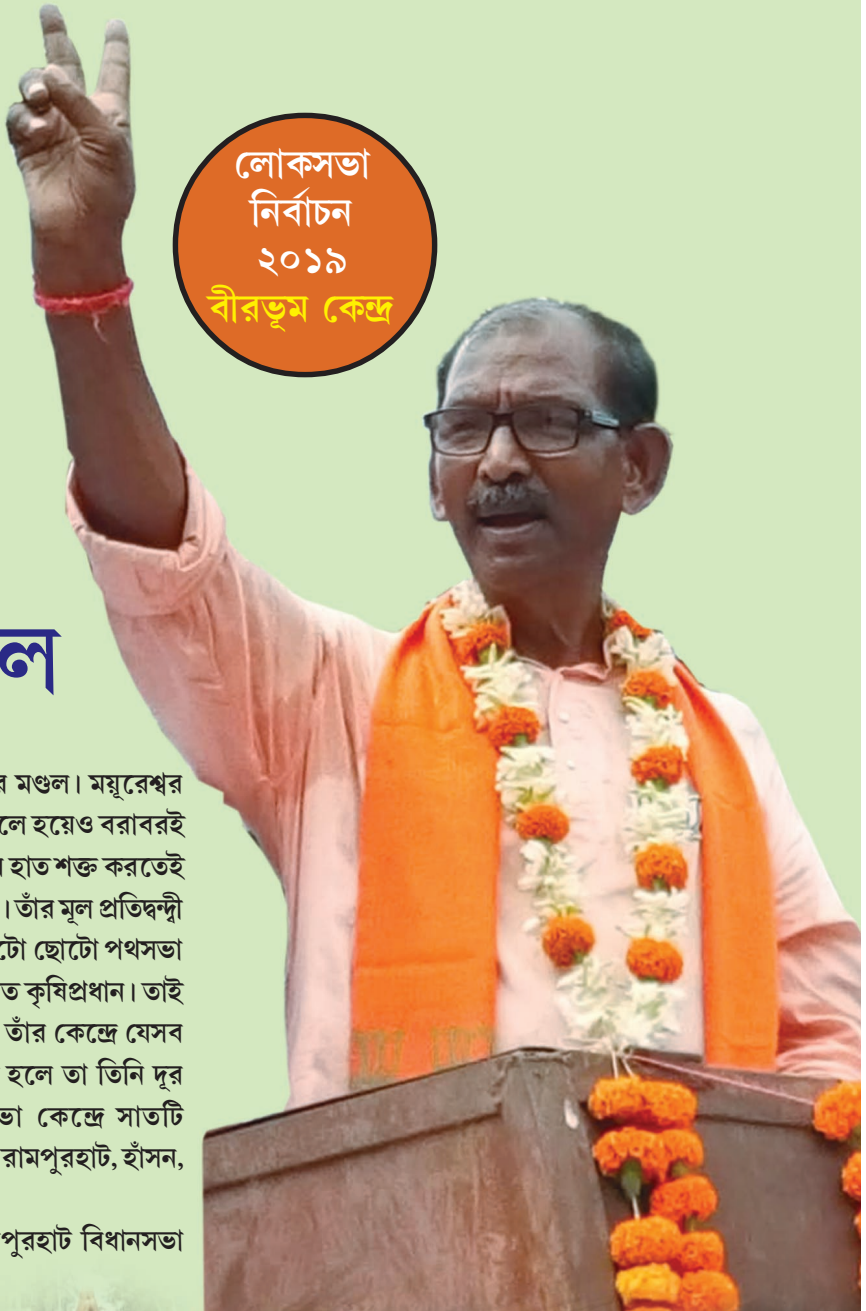

বীরভূম কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল। ময়ূরেশ্বর থানার ব্রাহ্মণবহড়া গ্রামের এক সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও বরাবরই তিনি একজন সমাজকর্মী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করতেই তিনি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। তাঁর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায়। দুধকুমারবাবু ছোটো ছোটো পথসভা করে জনসম্পর্ক করছেন। তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র মূলত কৃষিপ্রধান। তাই কৃষি ও কৃষকদের উন্নতিই তাঁর মুখ্য নির্বাচনী ইস্যু। তাঁর কেন্দ্রে যেসব এলাকায় পানীয় জলের অভাব রয়েছে, নির্বাচিত হলে তা তিনি দূর করবেন বলে জানিয়েছেন। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভা হলো— দুবরাজপুর, সিউড়ী, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি ও মুরারই।

এর আগে ২০১৬ সালে দুধকুমার মণ্ডল রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
হাওড়া কেন্দ্র

নতুন মুখ হলেও সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছেন রন্তিদেববাবু

এবারে হাওড়ায় বিজেপির প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক রন্তিদেববাবু কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পরিবর্তন পত্রিকায়। ১৯৮৪ সালে প্রয়াত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত দৈনিক বর্তমান শুরু করার পর রন্তিদেববাবু তাতে যোগ দেন। অবসর নেওয়ার সময় তিনি ছিলেন সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক। তবে অবসর নিলেও রন্তিদেববাবুর কলম এখনও সচল। বর্তমানে তিনি জাতীয়তাবাদী স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক। লেখালেখির পাশাপাশি যুক্ত রয়েছেন একাধিক সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে। হাওড়ায় মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

একসময় হাওড়া ছিল সংগীত ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বাণিজ্যক্ষেত্রেও হাওড়ার সুনাম ছিল। কিন্তু চৌত্রিশ বছরের বামশাসন এবং আট বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে হাওড়া এখন মাফিয়া আর তোলাবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত। রন্তিদেব সেনগুপ্ত নির্বাচনে জয়লাভ করলে হাওড়াকে আবার সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বমহিমায় ফেরাতে চান। উন্নত করতে চান সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা। মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হাওড়া এবং এখানকার মানুষকে বাঁচাতে চান অকালমৃত্যুর হাত থেকে।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
আসানসোল কেন্দ্র

আসানসোল থেকে দ্বিতীয়বার জেতার জন্য তৈরি বাবুল সুপ্রিয়

এবারের লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল প্রথম থেকেই খবরে। গতবার এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির বাবুল সুপ্রিয়। এবারও তিনি বিজেপির প্রার্থী। তাঁর মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের মুনমুন সেন। বাবুল সুপ্রিয় বয়সে তরুণ। হিন্দি সিনেমার সফল গায়ক হবার সুবাদে সারা দেশেই সুপরিচিত। বাবুলের জনসংযোগের ক্ষমতাও অসাধারণ। রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রের বাইরে তিনি সংগীত ও সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত।

আসানসোলের পরিচিতি শিল্পাঞ্চল হিসেবে। গতবার এই কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হবার পর বাবুল সুপ্রিয় শিল্পাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য তাঁর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এবারের

নির্বাচনে জয়লাভ করলে তিনি শিল্পাঞ্চলকে তৃণমূলের মদতপুষ্ট মাফিয়াদের কবল থেকে মুক্ত করতে চান। পাণ্ডবেশ্বর, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটি ও বারাবনি— এই সাতটি বিধানসভা আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত।

Advt.

কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের বিস্তারই লক্ষ্য আরামবাগ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তপনবাবুর

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
আরামবাগ কেন্দ্র

আরামবাগ লোকসভা নির্বাচন এবার জমে উঠেছে। বিজেপি প্রার্থী তপন রায় বয়সে তরুণ। স্থানীয় একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর কথা ও ব্যবহার সকলকে আপন করার মতো। তাঁর প্রধান নির্বাচনী প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের অপরূপা পোদ্দার। লড়াইয়ে কোনওরকম খামতি রাখছেন না তিনি। অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র মূলত কৃষিপ্রধান। তাই কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পের বিস্তারই তাঁর লক্ষ্য। এছাড়া আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রেলপথটি যাতে সকল বাধা কাটিয়ে শীঘ্রই চালু হয় তার ব্যবস্থা তিনি করতে চান। আরামবাগ, তারকেশ্বর, চন্দ্রকোণা, হরিপাল, গোঘাট, পুরশুড়া ও খানাকুল— এই সাতটি বিধানসভা আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
বর্ধমান (দুর্গাপুর) কেন্দ্র

দুর্গাপুর থেকে সাংসদ হয়ে শিল্পখ্যাতি ফেরাতে চান আহলুওয়ালিয়া

শিল্পশহর দুর্গাপুরের 'জামাই' সুরিন্দর সিংহ আহলুওয়ালিয়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। রাজনৈতিক জীবন শুরু কংগ্রেস থেকে। ১৯৮৬ সালে বিহার থেকে প্রথম রাজ্যসভার সাংসদ হন। পরে লোকসভার সাংসদ ও একাধিক কেন্দ্রে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীকালে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০১৪ সালে দার্জিলিং থেকে প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর খুবই কাছের লোক। তিনি কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। সেই কারণে দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কারখানার পুনরুজ্জীবন নিয়েও উদ্যোগী হয়েছেন। আর তাই বর্ধমান-দুর্গাপুরের মতো শিল্প-কৃষিপ্রধান আসনটি মোটেই হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। আর তাই সুরিন্দর সিংহ আহলুওয়ালিয়ার মতো প্রবীণ রাজনীতিবিদকে প্রার্থী করে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি। এদিন ফোনে সুরিন্দরবাবু জানান, 'জন্ম ও এবং পড়াশোনা সবই শিল্পাঞ্চলে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও জয়ের বিষয়ে আশাবাদী।' তিনি জানান, 'পঞ্চাশের দশকে দুর্গাপুরে যেমন শিল্পের প্রসার ঘটেছিল, তেমনই বিজেপি ক্ষমতায় এলে আবার শিল্প প্রসারের দিকে নজর দেবেন।

শ্রী আহলুওয়ালিয়া মূলত আসানসোলের জেকে নগরের বাসিন্দা। পড়াশোনা আসানসোলে। এছাড়া পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পেশায় আইনজীবী। দুর্গাপুর গোপাল মাঠে বাঙ্গালি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে বিয়ে করেন। স্ত্রী মণিকা আহলুওয়ালিয়া।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্র

নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পরেশ চন্দ্র দাস

এই কেন্দ্রে এবারে বিজেপি প্রার্থী পরেশ চন্দ্র দাস। পরেশবাবু প্রাক্তন আমলা। নিজের সমর্থনে ভোটের প্রচারে তিনি ভোট যেমন চাইছেন তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের কথাও তুলে ধরছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন নতুন নতুন প্রকল্পের কথা তুলে ধরে কী ধরনের উপকার পাওয়া যায়, সেই বিষয়ও তিনি মানুষজনের কাছে তুলে ধরছেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। অথচ এই রাজ্যে সেইসব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। সমাজের তপশিলি সম্প্রদায়ের জীবনযন্ত্রণা তিনি বোঝেন কেননা তিনি এই শ্রেণী থেকে উঠে এসেছেন। এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৭টি বিধানসভা হলো— রায়না, জামালপুর, কালনা, মেমারি, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, পূর্বস্থলী উত্তর ও কাটোয়া।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ রানাঘাট কেন্দ্র

বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার

আসন্ন নির্বাচনে রানাঘাট লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার বয়সে তরুণ। সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর যেসব প্রকল্প রয়েছে তা প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথা, দেওয়ালে নয়, পদ্মফুল মানুষের হৃদয়ে আছে। কেন্দ্রের যেসব দাবিদাওয়া আছে, তা পূরণের তিনি চেষ্টা করবেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি প্রচার করছেন। এই ক'দিনের মধ্যেই তিনি মানুষের হৃদয় জয় করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছেন। জগন্নাথ সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ হিসাবেও একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। রাজনৈতিক জগতে 'কাছের মানুষ, কাজের মানুষ' যাদের বলা হয় জগন্নাথবাবু ঠিক সেইরকম একজন মানুষ। দলমত নির্বিশেষে সকলের পাশে থাকতে চান তিনি। জগন্নাথবাবুর আশা, মানুষের ভালোবাসা ইভিএম মেশিনেও প্রতিফলিত হবে। তিনি নরেন্দ্র মোদীর ভারত-ভাবনা রানাঘাটের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান। পেশায় তিনি হাইস্কুলের শিক্ষক। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ৮টি বিধানসভা হলো— নবদ্বীপ, চাকদা, কৃষ্ণগঞ্জ, উত্তর-পশ্চিম রানাঘাট, উত্তর-পূর্ব রানাঘাট, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, রানাঘাট দক্ষিণ ও শান্তিপুর।

Advt.

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯
পুরুলিয়া কেন্দ্র

জ্যোতির্ময়ের যোগ্য নেতৃত্বই আকর্ষিত করেছে পুরুলিয়ার মানুষকে

এবারের পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আইনের ছাত্র হয়েও আইনকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ না করে সমাজসেবাকেই ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে জেলায় সংগঠনকে মজবুত করেছেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলার বিজেপি কর্মীদের ওপর তৃণমূলি গুন্ডারা ডাভা গ্রামের দুলাল কুমার এবং সুপুরডির ত্রিলোচন মাহাতোকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। জ্যোতির্ময়বাবু সেই সময় ওই দুই গ্রামে দুই পরিবারের ও গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস জুগিয়েছেন। কয়েকদিন আগেও আড়ষা থানার সেনাবনা গ্রামের দলের যুব মোর্চার সদস্য শিশুপাল সহিসকে তৃণমূলের গুন্ডারা মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। জ্যোতির্ময়বাবুর দাবি, এসব সত্ত্বেও যোগ্য নেতৃত্বে পুরুলিয়ার মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন।

পুরুলিয়ার লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা--- (১) বলরামপুর, (২) বাগমুণ্ডি, (৩) জয়পুর, (৪) পুরুলিয়া, (৫) মানবাজার, (৬) কাশীপুর, (৭) পারা।

স্বাধীনতার সাতদশক পেরিয়ে গেলেও পুরুলিয়ায় পানীয় জলের সমস্যা মেটেনি। হয়নি রাস্তা নির্মাণও। সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভের কথা এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জ্যোতির্ময়বাবুর অজানা নয়। তিনি নির্বাচিত হলে এই সমস্যার সমাধানকেই অগ্রাধিকার দেবেন বলে জানিয়েছেন। জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো সমাজমনস্ক এবং বন্ধুবৎসল। এলাকার মানুষের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক। অনেকদিন থেকেই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

Advt.

কবি ও রজকিনী

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও সাধনভূমি রূপে পরিচিত। অখণ্ড গৌড়বঙ্গে বা রাঢ়বঙ্গে যেসব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে, সেইসব পুঁথির ভণিতার মধ্যে তিনজন চণ্ডীদাসের নাম জানা যায়— বড়ু, দ্বিজ ও দীন। প্রত্যেকের নামের সঙ্গে 'চণ্ডীদাস' শব্দ যুক্ত, ফলে সাহিত্য বিশারদদের মতে, 'চণ্ডীদাস' এক্ষেত্রে আসল নাম বা উপাধি নয়। কোনও কোনও সাহিত্য তাত্ত্বিকদের মতে, বাংলার গীতিকাব্যের লীলায়িত ধারার প্রবর্তক ও পদাবলী স্রষ্টা দ্বিজ চণ্ডীদাসই নানুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানুর, কীর্ণাহার ও কেতুগ্রামে অনেকানেক গল্প ছড়িয়ে আছে— বিশেষ করে রজকিনী রামীর সঙ্গে প্রণয়কাহিনি, সাধনভজন ও মৃত্যু কাহিনি ইত্যাদি। ১৪ শতক থেকে ১৫ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত কোনও এক সময় চণ্ডীদাসের জীবনকাল হিসেবে ধরা হয়। তাঁর আয়ু ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর বাবার নাম ভবানীচরণ, মা ভৈরবী। চণ্ডীদাস প্রথমে তন্ত্রসানী সহজিয়া বৌদ্ধসাধক ও পরে সহজিয়া বৈষ্ণব রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন দেবী বাশুলীর উপাসক। বৌদ্ধদেবী নিত্যা ষোড়শীর ১৬ জন সহচরীর অন্যতম বাশুলী।

এখানে সহজিয়া সাধনার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। অষ্টম শতকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বৌদ্ধ

সহজযান ধর্ম প্রচার করেন। সহজযানের বেশিরভাগ শাস্ত্র তিব্বতি অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সহজপন্থীদের আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গান। সহজিয়াদের সমস্ত পুঁথিই লেখা হতো আলো-আঁধারি ভাষায়, যাকে বলা হতো সান্ধ্যভাষা। সহজ মতের তিনটি পন্থা— অবধূতী (দ্বৈতবাদী), চণ্ডালী (দ্বৈত-অদ্বৈত কিছুই নয়) এবং ডোম্বী বা বডালী (অদ্বৈতবাদী)। সহজপন্থী সাধকরা মন্ত্রজপ ও পূজার্চনায় বিশ্বাস করতেন না। বস্তুত, 'সহজ' এমন একটা অবস্থা, যা পেলে সাধক-সাধিকার মায়াময় জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নাশ হয়। তখন আর আত্ম-পর ভেদজ্ঞান থাকে না। সংস্কার বিনষ্ট ও ভবমোহ বিলুপ্ত হয়ে থাকে শুধু শূন্যতার জ্ঞান— সে-অবস্থা যে-সুখে পর্যবসিত হয়, তাই হচ্ছে 'সহজ সুখ' বা 'মহাসুখবাদ'। সাধক-সাধিকা তখন সেই সুখানন্দে উন্মত্তের মতো আচরণ করে। বাইরের জগতের কিছুই তাদের সেই 'সুখানুভূতি' থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ওই অবস্থা লাভ করতে না পারলে সাধকের মুক্তিলাভও হয় না। পক্ষান্তরে, সহজযান ধর্মের মুখ্য অঙ্গ পরকীয়া সাধন। এর অর্থ দেহের যৌগিক পুজো ও ধ্যান, যাতে শরীরের সুখ ও আনন্দ হয়, সেটাই মূল ও একমাত্র কর্তব্য। ইন্দ্রিয় নিরোধ, কঠোর কৃচ্ছসাধন বা ব্রতধারণ ও নিয়ম পালন বৃথা। জীবনের সমস্ত পার্থিব আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো নিষ্কাম নারীসঙ্গ। জাতধর্ম নির্বিশেষে একাধিক নারীসঙ্গের প্রয়োজন চিত্তের সুখ ও সাধনার তাগিদে। আর সব কিছু শূন্য, কিছুরই স্বভাব নেই। এরই নাম মহাসুখবাদ। তবে সহজিয়া নর-নারীরা গুরুর উপদেশে মহাসুখবাদের সাধনা করতেন। তাদের গুরু বজ্রগুরু নামে

পরিচিত।

পরবর্তীকালে সহজিয়া বৌদ্ধরাই ঘটনাচক্রে বা সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ধারাবাহিকতায় সহজিয়া বৈষ্ণব হয়। এদের আদি গুরু স্বরূপ দামোদর। তাঁর শিষ্য পরম্পরা হলেন রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও সিদ্ধ মুকুন্দদাস। সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মব্যাখ্যাতা ও তত্ত্বকথার পুঁথি রচনাকার রূপে মুকুন্দদাস আজও সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে সম্মাননীয় শেষ গুরু। তাঁর চার শিষ্য থেকেই আউল, বাউল, সাঁই ও দরবেশ— এই চার স্তরের সাধনার উদ্ভব হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নারী সঙ্গ সাধনা নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে গৌড়বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ ও শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর— এই তিন বৈষ্ণবাচার্যের সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যায়। তখন সহজিয়া সম্প্রদায় নিত্যানন্দের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। নিত্যানন্দের প্রয়াণের পরে সহজমার্গীরা ছোটো বড়ো ১০০টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে।

কথিত আছে, সহজমার্গে পরকীয়া সাধনের প্রয়োজনে চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন তাঁর আরাধ্য হলেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। রামীর সঙ্গে পরকীয়া সাধনেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। চণ্ডীদাস ও রামীকে ঘিরে সেকালে অনেক গল্প চালু হয়েছিল। যেমন, ধোপানি রামী (তাঁর একাধিক নাম শোনা যায়— রামতারা, রামমণি ও তারা ধুবনী) থাকতেন নানুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে তেহাই গ্রামে। তখন বাশুলী দেবীর সেবক ছিলেন চণ্ডীদাস। একদিন সুন্দরী যুবতী রামী মন্দিরে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। চণ্ডীদাস তাঁকে মন্দির পরিষ্কারের কাজ দেন। অন্য মতে, রামী কোনও পুকুরে কাপড় কাচতে আসতেন। সেখানে চণ্ডীদাস ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। সেই সূত্রে উভয়ের আলাপ-পরিচয় এবং পরে প্রণয় ও সাধনা। কিন্তু গ্রামবাসীরা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে এক 'নীচজাতীয়া' নারীর উন্মত্ত পিরিতি মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রেমিক-প্রেমিকাকে কলঙ্ক লেপন করে মন্দির ও গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। চণ্ডীদাস তেহাই গ্রামের প্রান্তে রামীর জীর্ণ কুটিরে চলে যান। সেখানে উভয়ে সহজ মার্গের সাধনা করতে লাগলেন। তাঁদের সাধনা ছিল নিষ্কাম, অন্তরে শ্যাম ও শ্রীমতীর যুগলমূর্তির মিলন দর্শন। এই সহজ সাধনাই চণ্ডীদাসকে সুমধুর কবিতা রচনার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

কোনও কোনও সারস্বত পণ্ডিতের বক্তব্য : চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল বর্ধমানের কেতুগ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম চরণদাস ঠাকুর। তিনি কেতুগ্রামে দেবী চণ্ডীর উপাসনা করতেন। চণ্ডীর উপাসক বলেই চণ্ডীদাস নামে খ্যাত হন। পরে এক অস্পৃশ্য বিধবা রমণীকে বিয়ে করলে কেতুগ্রামবাসীরা তাঁকে 'একঘরে' বা সমাজচ্যুত করে। ফলে চণ্ডীদাস স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসেন নানুরে।

শেষ জীবনে চণ্ডীদাস রামীকে নিয়ে কীর্ণাহারের কোনও নাটমন্দিরে কীর্তন গাইতে গিয়েছিলেন। সেখানে গৌড়েশ্বরের (গৌড়েশ্বর কে, তা অজ্ঞাত, মতান্তরে কীর্ণাহারের জায়গিরদার) এক রানিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। আগেও চণ্ডীদাসের গানের একনিষ্ঠ অনুরাগিণী এই রানি কবির যে কোনও কীর্তনের সভায় উপস্থিত থাকতেন। উন্মার্গগামী রানির এহেন বাড়াবাড়িতে জায়গিরদার বা গৌড়েশ্বর অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করেছিলেন। তো, গান গাওয়ার সময় হঠাৎ নাটমন্দির ধসে পড়লে রামী ও চণ্ডীদাসের জীবন্ত সমাধি ঘটে। জনশ্রুতি, গৌড়েশ্বর কামানের গোলায় নাটমন্দির ধ্বংস করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনারই রকমফের হলো : চণ্ডীদাস রামীর সঙ্গে গৌড়েশ্বরের বাড়িতে গান গাইতে গেলে, গানে মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বরের মহিষী তাঁর প্রেমে পড়েন এবং আত্মবিস্মৃত বা বেসামাল হয়ে সেই গুপ্ত বাসনা তিনি প্রকাশ্যে স্বামীকে জানান। এমন অভাবনীয় ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গৌড়েশ্বর চণ্ডীদাসকে হাতির পিঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে, মাথা নীচে ঝুলিয়ে, হাতি চালাবার নির্দেশ দেন। ওই দণ্ডাদেশে চণ্ডীদাসের শোচনীয় মৃত্যু হলে রামী ও রানি উভয়েই আকস্মিক আঘাতে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে মারা যান।

বোলপুর থেকে বাসে চণ্ডীদাস-নানুর যাওয়া যায়। নানুর বাসস্টপ থেকে ডান দিকের গলিপথে ২/৩ মিনিট হাঁটলেই গ্রামের সামনে ১৭ ফুট উঁচু ও ৫০০ ফুট ব্যাসের এক প্রসারিত প্রাচীন ঢিবি নজরে পড়ে। চণ্ডীদাসের ধর্মসাধনার স্মৃতিজড়িত ওই ঢিবি খুঁড়ে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা, মাটির পাত্র, ইট ও নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। ঢিবির ওপরে ডান দিকে বাশুলী দেবীর মন্দির ও ১৪টি শিবমন্দির। অধিকাংশই চারচালা, দুটি মন্দিরে টেরাকোটা অলংকরণ আছে। বাশুলী মন্দিরে এক ফুট লম্বা কষ্টিপাথরে খোদিত বিদ্যার দেবী অর্থাৎ বাগীশ্বরী মূর্তি। শুয়ে থাকা পুরুষের নাভিপদ্মে দেবী বাঁ পা মুড়ে ও ডান পা ঝুলিয়ে ললিতাসনে বসে আছেন। চার হাতের মধ্যে ডানদিকের ওপরের হাতে জপমালা, বাকি তিনটি হাতে বীণা। বাশুলীর পুজো হয় আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত। আর কার্তিকের একাদশী তিথি থেকে নয়দিন চণ্ডীদাসের স্মরণোৎসবে অহোরাত্র নামসংকীর্তন চলে। ■

‘চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ’

নরেন্দ্রনাথ মাহাতো

হিন্দু গ্রন্থে কোথাও মানবজাতিকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ অথবা উচ্চজাতি ও নিম্নজাতি— এই দু’ভাগে ভাগ করা হয়নি। ভারতের সংবিধানেও ভারতের নাগরিককে এই ভাবে বিভক্ত করা হয়নি। জাতি বা বর্ণ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উচ্চ-নীচের ধারণা প্রচার করলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭-এর সামাজিক সমতার অগ্রনয়নের পরিপন্থী হিসেবে দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলা অভিধানেও উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ বলে কোনও শব্দ নেই। তা সত্ত্বেও কথাবার্তায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদিতে আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করে আসছি। যা আমাদের অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে— চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। (৪/১৩) আমাকর্তৃক গুণ ও কর্ম অনুযায়ী চারটি বর্ণ উৎপাদিত হয়েছে। গুণ মানে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। চাতুর্বর্ণ্য হলো, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। এই বর্ণ বিভাগের তত্ত্বটি উচ্চ-নীচ বা আভিজাত্যমূলক নয়। এটা বৈচিত্র্যমূলক। প্রকৃতিভেদ অনুসারেই বর্ণভেদ। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হলো— গুণ ও কর্মবাচক। এগুলি কোনও মতেই জাতি বা গোষ্ঠীবাচক নয়। তথাপি বংশগত বা পদবি নির্ভর নয়। যেমন, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী ইত্যাদি পদবিধারীরা সকলেই ব্রাহ্মণ এবং দাস, মণ্ডল ইত্যাদি পদবিধারীরা সকলেই শূদ্র এটা শাস্ত্রের বক্তব্য নয়।

ব্রাহ্মণরা সত্ত্বগুণ প্রধান। তাঁদের কর্ম— শম, দম, তপঃ ইত্যাদি। এঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানের যোগ্য। ক্ষত্রিয়ের রজঃ গুণই প্রধান, সত্ত্বগুণ গৌণ। তাঁদের গুণ— শৌর্য, তেজ প্রভৃতি। এঁরা পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত। বৈশ্যেরা রজঃ গুণই প্রধান, তমঃ গুণ গৌণ। এঁরা কৃষি, গো-পালন ইত্যাদির যোগ্য। শূদ্রের তমঃ গুণ প্রধান, রজঃ গুণ গৌণ। এঁরা সমাজের সেবা-শুশ্রূষাদানে রত থাকেন। জন্মগত স্বাভাবিক প্রতিভা অনুসারে সমগ্র মানবজাতি এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যা বংশগত বা পদবি নির্ভর নয়। এঁদের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ অবান্তর। কারণ, কোনও একটি শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সমাজ চলতে পারে না। তাই মানুষের এই চারটি শ্রেণী চিরন্তন এবং শাশ্বত। সুতরাং ব্রাহ্মণজনোচিত কর্তব্য, ক্ষত্রিয়জনোচিত কর্তব্য, বৈশ্যজনোচিত কর্তব্য এবং শূদ্রজনোচিত কর্তব্যের মধ্যে কোনও প্রকার উচ্চ-নীচের ভেদ নেই। প্রত্যেকেরই আছে সমাজে সমান প্রয়োজন এবং সমান মর্যাদার স্থান।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— ‘‘সিংহাসনে আরূঢ় রাজা যে রূপ মহান ও গৌরবান্বিত, রাস্তার ওই ঝাড়ুদারও সেই রূপ। রাজাকে তাঁহার রাজ সিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ

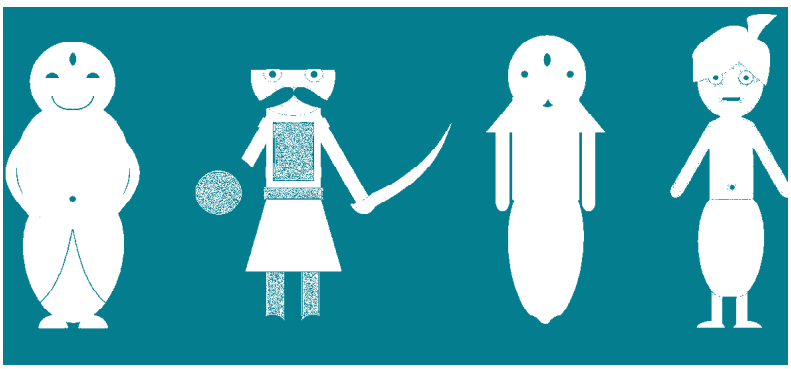

করিতে দাও— দেখ তিনি কতটা পারেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিহাসনে বসাইয়া দাও— দেখ, সে-ই বা রাজকার্য কিরূপে চালায়।’’ (বাণী ও রচনা, ১/৫৮)। অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ বলেছেন— ‘‘এ জগতে উচ্চ কাজ আর নীচ কাজ বলে যে ভেদ দেখান হয়, সেটা নিতান্ত কল্পিত। একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে নিত্যকাল নিমগ্ন হয়ে থাকাই উচ্চ কাজ। জগতে অপর সকল কাজই নীচ কাজ। ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন হয়ে যে মাংস বিক্রয় করে, ব্রহ্মরসের অনাস্বাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চেয়ে সে উচ্চ।’’ তিনি আরও বলেছেন— ‘‘জাতির প্রকৃত পরিচয় জীবনের কর্মে। দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষার জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিতে পারে, সে ডোমের ছেলে হলেও ক্ষত্রিয়, মুচির ছেলে হলেও রাণা প্রতাপের সহোদর ভ্রাতা। অন্তর্জগতের দিব্য সত্য যার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে, সে জবালার ছেলে হলেও ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের ঔরসজাত হলেও সে নৈমিষারণ্যের ঋষিদের জাতি। জাতির প্রকৃত পরিচয় জীবনের বিকাশে, জন্ম-বিচারে নয়।’’ ‘‘যেখানে ত্যাগের জোর আছে, জ্ঞানের জোর আছে, সেখানে ব্রাহ্মণত্ব আছে বলে জানবে এবং চামারের ছেলেকেও ব্রাহ্মণ বলে পূজা করবে। যেখানে শৌর্য্য আছে, বীর্য আছে, তেজস্বিতা আছে, সেখানে ক্ষত্রিয়ত্ব আছে বলে জানবে এবং ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য সম্মান সেখানে দেবে। যেখানে ত্যাগের পিছনে ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি আছে, দানের পিছনে লাভের লোভ আছে, সেখানে বৈশ্যতা আছে বলে জানবে। দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে কেউ কখনো ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হয় না। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি বে-হিসাবির বৃত্তি। এঁরা প্রাণেরই ব্যবসায়ী, প্রাণ হিসাব করে জাগে না।’’ অর্থাৎ ‘‘পরত্রাণই যাহার ব্রত, সে ক্ষত্রিয়। আত্মত্রাণই যাহার লক্ষ্য, সে বৈশ্য। আত্মত্রাণেও যাহার রুচি নাই, সে শূদ্র। বিশ্বত্রাণ যাহার লক্ষ্য, সে ব্রাহ্মণ।’’ (অখণ্ড-সংহিতা)।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— ‘‘জাতি— বিভাগ যথার্থ কী তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ! ...বর্তমান বর্ণ বিভাগ (কাস্ট) প্রকৃত জাতি নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক। ...প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা বালক-বালিকার জন্মমাত্র জাতি নির্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি-প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব; আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়া লইয়াছে। ইহা যদি পুনরায় পুরাপুরিভাবে চালু হয়, তবেই আমরা উঠিতে পারিব।’’ (বাণী ও রচনা ৭/৬০)। বলাবাহুল্য, সর্ববিধ বেদবিহিত বা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুধাবন করতে হলে জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান প্রয়োজন। তাই জ্যোতিষকে বেদের চক্ষুস্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণবিভাগের তত্ত্ব বুঝতে জ্যোতিষশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। অতএব, বংশ বা পদবি দেখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র চেনার উপায় নেই। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

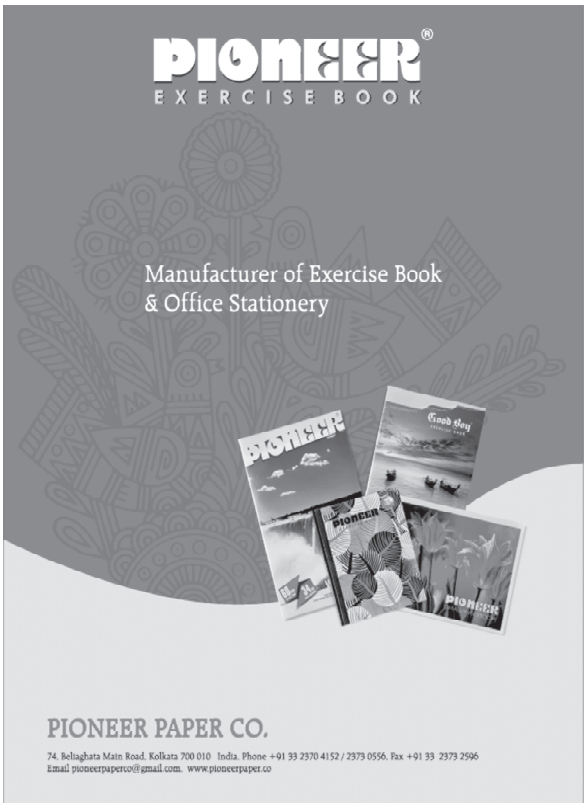

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

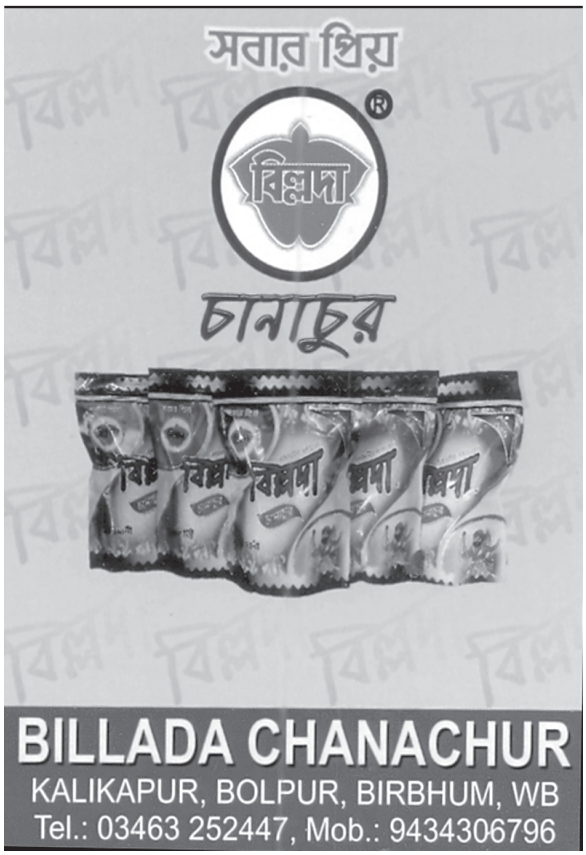

কোন জাদুস্পর্শে কালীঘাট হয়ে উঠছে ব্যানার্জিপাড়া?

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে জাতীয় স্তরে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে একটি পরিবারের বিরুদ্ধেই— নেহরু বা গান্ধী পরিবার। এখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭২ বছরে রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ একটি পরিবারের বিরুদ্ধে— ব্যানার্জি পরিবার।

সনাতন রায়

পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখেছেন? সিনিয়র পি সি সরকারের? একজন সুন্দরী মহিলাকে ঢেকে দিতেন কালো কাপড়ে। তারপর অদ্ভুত কায়দায় বনবন করে ঘোরাতেন হাতের জাদুদণ্ড— দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড। আর মুখে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জিভ নাড়তেন— আওয়াজ বেরোত গিলি গিলি গিলি...। ম্যাজিক্যাল ওয়ান্ডারটা প্রকাশ পেত এর পরই। কালো কাপড়টা সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা যেত সুন্দরী মহিলা নেই। ভ্যানিশ! ঝকমকে পোশাকে সজ্জিত পি সি সরকার ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসতেন কোলগেট হাসি। আর গোটা হলঘর ফেটে পড়ত দমবন্ধ করা হাততালির শব্দে। সিনিয়র পি সি সরকার গত হয়েছেন অনেক কাল আগেই। কিন্তু এখন খোদ কলকাতার বুকেই কলকাতার বহু নাগরিকের চোখের সামনে বসেই ওই খেলা দেখাচ্ছেন এক পিসি। কালীঘাট পাড়ার অতি প্রাচীন এক নিম্নবিত্ত পাড়া হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে পিসি-র জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় এক এক করে নির্বাসনে চলে যাচ্ছেন বাসিন্দারা যারা ওই অঞ্চলে বাস করছেন ২/৩ কিংবা ৪/৫ পুরুষ ধরে আদিগঙ্গার জোয়ারের জল ঠেলে, কাছেই রেডলাইট এরিয়ার যন্ত্রণা সয়ে। রাতারাতি হাপিস হয়ে যাচ্ছেন সেই সব ভাড়াটিয়ারা যাঁরা স্বল্প পয়সায় অন্ধকূপে জীবনযাপন করতেন দিনভর রিক্সা টেনে বা মুদির দোকানে বেগার খেটে। এই ছিল এই নেই। ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে হাবু বাগের পানের দোকান, সুরজের মুদীর দোকান। উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন বরুণ দেবনাথ, রবি চক্রবর্তীরা। আর তারপর ওইসব জমিতে লটকে দেওয়া হচ্ছে 'বিশ্ববাংলার লোগো কিংবা, লিপস্ অ্যান্ড বা কাউন্ডস-এর সাইনবোর্ড, নয়তো তেরঙা পতাকা লাগানো তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস। এই আশ্চর্য দক্ষতায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বুজে যায় আদিগঙ্গার গভীরতা। আর দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি করে আর এক ওয়ান্ডার— আদিগঙ্গার বুকে কংক্রিটের প্রাসাদ।

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এমনি করেই পি সি-র ম্যাজিকে বদলে যাচ্ছে কালীঘাটের কালীঘাট রোড আর হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। এক, ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ছাড়া। সেখানে আজও সেই টালির চাল— যে চালে ঢালের রক্ষা পেয়েছিলেন বহু চিট ফান্ডের কর্তা, সোনা পাচারকারীরা, নীল-সাদা রঙের কারবারি থেকে শুরু করে ক্রিকেট, ফুটবল, বিবেক মেলার কারবারিরা, হয়তো বা পুরীর কোনও কোনও হোটেল মালিকও।

ঘটনাটা অদ্ভুত। সবাই সব জানে, কিন্তু কেউ জানে না। সবাই জানে কালীঘাট পাড়ায় যে দুনিয়াদারির সম্রাট— তাদের নাম কার্তিক ব্যানার্জি, স্বপন ব্যানার্জি, অজিত ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি এমনকী এক বিদেশি নাগরিক মহিলাও। সবাই জানে, রাজ্য রাজনীতির সাম্রাজ্ঞীর পরিবারেই সদস্য এরা সবাই। কিন্তু সবার মুখে কুলুপ। সব সংবাদমাধ্যমের কলম এবং ক্যামেরা বন্ধ।

বিরোধী শিবিরও কোনও এক জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় অদ্ভুত নীরবতার শিকার। হাবু বাগের জমিতে উচ্ছেদের পর বসেছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস। তিনমাস আগে সেই পার্টি অফিস চলে গেল মুক্তদল মোড়ে। কর্পোরেশনের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের অফিসের ভিতরেই রমরমিয়ে চলছে পার্টি অফিস। আর জমিটা এখন কার্তিক ব্যানার্জির দখলে। ভাঙাভাঙি চলছে। এবার অপেক্ষা বহুতলের। সবাই জানে, ৪৫/ডি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির মালিক ছিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। সেই বাড়ির দখল নিল জনৈক স্বপন দে। তারপর তা হাতফেরত হয়ে চলে এল স্বপন ব্যানার্জির কাছে। ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করা হয় গায়ের জোরে। শেষ উচ্ছেদ বাহিনীর শিকার সত্যজিৎ দে— স্বপন দে-র ভাই। এখনও ভাড়াটিয়া আছে দু'ঘর। শুধু উচ্ছেদের অপেক্ষায়। ৩৩ নম্বর হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ছিল জ্ঞান সিংহের জিভে জল আনা রুটি-তরকার হোটেল। এখন? নেই। পাশেই ছিল প্রহ্লাদ কাকার হোটেল। এখন? হাওয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ ওখানেই জন্ম নিয়েছে স্বপন ব্যানার্জি ওরফে বাবুনের ঝাঁ তকতকে ক্লাব স্পোর্টস লাভোর্স অ্যাসোসিয়েশন। পুলিশও জানে ৮০ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা দীপক হাজরা আর তার দিদি তাদের জমি ও গ্যারেজ গায়ের জোরে দখলের বিরুদ্ধে থানায় এফ আই আর করেছেন। মারধরও খেয়েছেন। পুলিশ চুপ, প্রশাসনও চুপ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, চুপিচুপিই, প্রায় নিঃশব্দেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট আর কালীঘাট রোড-সহ গোটা কালীঘাট পাড়াটাই ব্যানার্জি পাড়া হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তিনতলা একটি হোয়াইট হাউস। যার মালিক সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। সেই বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল। দোতলা, তিনতলায় ওঠার জন্য এসক্যালেটার। অজস্র পিতলের ও রুপার তৈরি থাইল্যান্ডিয় বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি। আর এক কোটি টাকা মূল্যের এক অনবদ্য ঝাড়বাতি।

ব্যবসা? প্রতারণা? নাকি লুট? আর সব কিছুই কি ওই টালির চালের বাসিন্দার মহিমায় যিনি সততার প্রতিমূর্তি হয়ে ঝোলেন কাটআউটে রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টে, গাছের ডালে কিংবা মেট্রো রেলের পিলারে? এ সবই কি তাঁরই অনুপ্রেরণায় যিনি কথায় কথায় মা মাটি মানুষ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, যিশুখ্রিস্ট, মহম্মদ আউড়ান? আর ভোটের মুখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নামে মিথ্যা আরোপ চড়িয়ে গলাবাজি করেন? মুসলমানদের তুষ্ট করতে হিজাব পরেন। হিন্দুদের তুষ্ট করতে গঙ্গাজল ছেটাতে বলেন কিন্তু নিজে ছেটান না।

অতি সম্প্রতি প্রকাশ্যে চলে এসেছে আরও এক ভয়ঙ্কর কাহিনি আর তা নিয়েই এখন রাজ্যরাজনীতি তোলপাড়। জানা গিয়েছে, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই 'সততার প্রতিমূর্তির ঘরে বাসা বেঁধেছেন তাইল্যান্ডের এক নারী। তিনি পিসি-র ভাইপোর স্ত্রী। তাঁর জন্ম ব্যাঙ্ককে। নাম রুজিরা নারুলা। বিয়ের পর হয়েছেন রুজিরা নারুলা ব্যানার্জি। ২০১০ সালের ৮ জানুয়ারি তাইল্যান্ডে ভারতীয় দূতাবাস তাঁকে পার্সন অব ইন্ডিয়ান অরিজিন (পিআইও) কার্ড অনুমোদন করে। ওই কার্ডের জন্য রুজিরার করা আবেদনপত্রে তাঁর বাবার নাম লেখা হয়েছিল নিফন নারুলা। ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয় অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে। ২০১৭ সালে রুজিরা কলকাতার এফ আর আর ও অফিসে পি আই ও কার্ড পরিবর্তন করে ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া (ওসিআই) স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদনের সঙ্গে তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে সংগঠিত তাঁর বিয়ের সার্টিফিকেটের নথি জমা দেন। কিন্তু রহস্যটা দানা বাঁধে যখন দেখা যায়, ওই নোটিশে রুজিরা তাঁর বাবার নাম লেখেন গুরু গুরুশরণ সিংহ আহুজা। ঠিকানা দিল্লির রাজৌড়ি গার্ডেন। এখানেই শেষ নয়। নিজের তাইল্যান্ডের নাগরিকত্ব গোপন করে ২০০৯ সালের ১৪ নভেম্বর রুজিরা প্যান কার্ডের জন্য আবেদন করেন। সেখানেও তাঁর বাবার নাম লেখা হয় গুরু গুরুশরণ সিংহ আহুজা। তাহলে তাঁর পাসপোর্টে বাবা হিসেবে উল্লেখ করা নিফিন নারুলা কে?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উপসচিব মনোজকুমার ঝা'র অভিযোগ, তাইল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে প্যান কার্ডের জন্য রুজিরা ৪৯এএ ফর্মে আবেদন করার কথা। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ জোর করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্যের সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী খোলা প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন তুলেছেন— (১) ওই ভদ্রমহিলা নাকি চিকিৎসার জন্য মাঝেমাঝেই ব্যাঙ্কক যান। কিন্তু ব্যাঙ্কক তো চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত নয়। তাছাড়া কী এমন অসুস্থতা যে এক মাসের মধ্যে তাঁকে ২১ বার ব্যাঙ্কক যেতে হয়েছে?

(২) তিনি কেন নিজের পরিচয় গোপন করছেন? উদ্দেশ্যটা কী?

(৩) মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে একজন বিদেশি নাগরিক বাস করছেন কেন?

এই ঘটনার পরপরই সংবাদপত্রে দেখা গেল, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী প্রকাশ্যে জনসভায় ঘোষণা করেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মা।'' নিঃসন্দেহে এটা কথার কথা। যেমনটি মুখ্যমন্ত্রীকে 'জঙ্গলমহলের মা' বলেছিলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতী ঘোষ। তবে নিন্দুকদের নজর তো কিছুই এড়ায় না। তাঁরা তাই প্রশ্ন তুলেছেন— তৃণমূল কংগ্রেসে সবার বাবা মা নিয়ে নিত্যনতুন তথ্য কেন? কদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাবাকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে ফেললেন। এখন আবার মিমি চক্রবর্তী...। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে না তো?

এসব প্রশ্ন আগে ওঠেনি। এখন উঠছে, কারণ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে জাতীয় স্তরে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে একটি পরিবারের বিরুদ্ধেই— নেহরু বা গান্ধী পরিবার। এখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭২ বছরে রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ একটি পরিবারের বিরুদ্ধে— ব্যানার্জি পরিবার। টালির চাল দেখে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। কেঁচোই বলুন আর সাপই বলুন— সবই আছে ওই টালির চালের আশীর্বাদে। ■

রামনামে মাতোয়ারা বঙ্গভূমি

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

২০০২ সাল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছি। লোকসংস্কৃতির একজন অধ্যাপক ক্লাস নিচ্ছেন; বিষয়ে প্রবেশ করার আগে অধ্যাপক সভার কাছে জানতে চাইছেন বাঙ্গলার সর্বাপেক্ষা অধিক পূজিত ও মান্য পুরুষ-দেবতার নাম কী এবং নারী-দেবতার নামই বা কী?

বললাম, আপাতত উত্তরটুকু হচ্ছে পুরুষ-দেবতা শিব এবং নারী- দেবতা মনসা। অধ্যাপক সঠিক বলে মেনে নিলেন। তারপরই বলে ফেললাম এক অপ্রিয় তেতো সত্য— আগামী পঞ্চাশ বছরে শ্রীরাম হতে চলেছেন বাঙ্গলার সর্বাধিক মান্য পুরুষ দেবতা। সভায় সঙ্গে সঙ্গে গুজন শুরু হলো, ছিছিক্কার; পরে লাঞ্চের সময় 'সাম্প্রদায়িক-বর্বর' আখ্যায়িত হতে বাকি রইলো না। শুধু বললাম, 'পশ্চাতে রাখিছো যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' শ্রীরাম বাঙ্গলার হিন্দিভাষী দেব-সংস্করণ এবং রামের নামে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বলে যতই প্রোপাগান্ডা করুন না কেন, রামকে বাধা দিলে তিনি বহুগুণ তীব্রবেগে রথ নিয়ে বঙ্গদেশে ঢুকবেন।

তখন বাম না রাম— এইভাবে প্রগতিশীল ও অসভ্য-বর্বর বিবেচনা করা হতো। বাম-জমানায় কেউ যদি 'জয় শ্রীরাম' বলতেন; দ্বিধাহীনভাবে বলতেন, 'আমি হিন্দু'; হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করতেন; বাংলাদেশে, পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরোধিতা করতেন; কাশ্মীরি-ব্রাহ্মণদের স্বভূমি থেকে উৎখাত বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন— তাকে বা তাদের আরএসএস- বিজেপি বলে দেগে দেওয়া হতো। ফলে আরএসএস বা বিজেপির সঙ্গে সেই বেচারি বাঙ্গালি হিন্দুর যোগ থাকুক চাই না থাকুক, তিনি 'চোদ্দো-আনা আরএসএস' হয়ে যেতেন। বামেদের ক্রমাগত কোণঠাসা করার প্রক্রিয়ায় তাদের ষোলো-আনা আরএসএস হতে সময় লাগেনি, অন্তত মনোভূমে।

যাইহোক, ২০০২ সাল থেকে হয়ে গেলাম 'বে-সেকুলারি এক অসভ্যতম জীব'। তার শাস্তি হিসাবে জুটলো গণ্ডায় গণ্ডায়, অবিচার আর অসভ্যতা, হাটে-ঘাটে-বাটের পর কর্মক্ষেত্রের মাঠেও। ইতোমধ্যেই বামাবলীর ঢাকনি থেকে ইশারা করা চোপা আঙ্গুল দেখেছিলাম তার দু'বছর আগে। ২০০০ সাল, একটি স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব নিলাম। তাতে পরতে পরতে বামাবলীর চাদরে ঢাকা উন্নয়নের নানান দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হতে লাগলো; যেমন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির টেন্ডার কেলেঙ্কারি, স্থানীয় সিপিএমের ভাঙ্গনের উৎস সন্ধানে ইত্যাদি। সঙ্গে গোল বাধালো রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে ১৯৪৫ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদের আগমন বিষয়ক এক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ; প্রবন্ধটি লিখেছিলেন রহড়া বালকাশ্রমের স্বনামধন্য বিধু মাস্টারমশাই, যিনি মনেপ্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী, গৈরিক-দেশপ্রেমী ছিলেন (বর্তমানে প্রয়াত)। কাজেই পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনে রামনামের গন্ধটা বোধহয় আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন স্থানীয় ও কর্মক্ষেত্রের বামকুল-তিলকেরা।

যাইহোক, এখন বাঙ্গলায় রামনবমী পালিত হচ্ছে প্রবল উৎসাহে। এটা হবারই ছিল। জোর-জুলুমি বাম-নাম যে রাম-নামকে আটকাতে পারে না, সেই অজ্ঞতার মাশুল দিতে সিপিএম-কে আগামীদিনে রামায়ণী-বৈঠক করতেই হবে, রামযাত্রার আয়োজনও করতে হতে পারে, রামনবমী উৎসবকে কেন্দ্র করে তারা আগামীদিনে রাম-সাহিত্য বিক্রির টিমটিমে স্টলও দিতে পারেন।

বর্তমানে রামনবমী বাঙ্গলার এক জনপ্রিয় উৎসবে পরিগণিত হয়েছে। গৈরিক-জাতীয়তাবাদী মানুষ তো বটেই তাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের পথ পরিক্রমা। আমজনতা হাজির হচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোথাও ক্ষত্রিয় দেবতা রামের সঙ্গে সাজুয্য বজায় রেখে অস্ত্র পূজনও হচ্ছে, হচ্ছে সশস্ত্র মিছিল, যেন পুরোপুরি সনাতনী হিন্দু বাঙ্গালি হিন্দু-সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ রামনামে মোহিত হয়েছেন, রাম-আরাধনাকে প্রতিবাদের এক অপূর্ব মঞ্চ করে তুলেছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। যারা বলেন রামের দেশ বাঙ্গলা ছিল না, রাম নিতান্তই হিন্দিভাষীদের খোট্টাভাষীদের দেবতা, তাদের বোধোদয় ঘটার দিন শুরু করবে রামনবমী। বাঙ্গালি অনেকদিন ধরেই ইষ্টনাম জপেছে, ''হরে রাম হরে রাম/রাম রাম হরে হরে/হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ/কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'' বাঙ্গালি ভুলে গেছে বাল্মীকির পর হিন্দিভাষারও পূর্বে রামের ভক্তিরসে জারিত হয়েছিল বাঙ্গালি কবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঞ্চালী'তে। বাঙ্গালি ভুলে গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের, রানি রাসমণির কুলদেবতা রঘুবীর। বাঙ্গালি মনে রাখেনি শ্রীরামকৃষ্ণ- সহ বাঙ্গালি মনীষার পূর্ব পুরুষের নামের মধ্যে স্বতঃই এসেছে 'রাম' কথাটি। বাঙ্গালিকে মনে করানো হয়নি বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতিতে, লোকসংগীত ও লোকনৃত্যে বারে বারে রামায়ণের কাহিনি ও চরিত্র ফুটে উঠছে। বাঙ্গলার লোক-কবিরা তাদের ছড়া, প্রবাদ, প্রচলন কথা ও লোককথায় রামনাম এনেছেন বারংবার। বাঙ্গলায় বসবাসকারী বনবাসী কৌমসমাজের লোককথায় রামায়ণ এসেছে এক লোক-ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। অথচ বঙ্গদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ পণ্ডিতেরা রামনামের ইতিবৃত্ত বিস্মরণীয় করে তোলার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

পরিশেষে বলতেই হয়, আগামী পঞ্চাশ বছরে বঙ্গদেশে সর্বাধিক মান্য নারী-দেবতা হতে চলেছেন মা কালী। পুরুষোত্তম শ্রীরামের তির-ধনুক আর মহাকালের বার্তাবহ মা কালীর খাঁড়া বাঙ্গালি জীবনে শক্তির অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটাবে, সঙ্গে বেরিয়ে আসবে মধ্যযুগীয়- প্রেমাস্পদ বংশীধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোদ্ধৃরূপ। শক্তির সমন্বয় সাধনই আগামীদিনের বাঙ্গালির একমাত্র কাজ, আর দ্বিতীয় কাজ হলো আসমুদ্রহিমাচলের সনাতনী চেতনার সঙ্গে তার যুগপৎ পথ চলা। ■

বিচারবোধ বিপদ থেকে রক্ষা করে

বহু বহু বছর আগে বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে এক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পড়াশুনা শেষ করে তিনি পরিবারের প্রথা অনুযায়ী ব্যবসা শুরু করেন।

পাঁচশো গোরুর গাড়ি ও বেশ কিছু লোকজন নিয়ে দেশ-বিদেশে তিনি বাণিজ্য করে বেড়াতেন।

এভাবে বাণিজ্য করার পথে তিনি একবার এক বনের সামনে এসে পড়লেন। তিনি শুনেছিলেন, এই বন খুব ভয়ংকর। বনে প্রচুর বিষফলের গাছ আছে। গাড়ি থামিয়ে তিনি তাঁর লোকজনদের বললেন, এই বনে খুব লোভনীয় ভাবে যে ফলগুলি দেখা যাবে সেগুলি বিষফল। ভুলেও কেউ যেন মুখে না দেয়। এই ফল খেলেই মৃত্যু অবধারিত।

বোধিসত্ত্বের কথা সবাই খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর তারা সেই বনে প্রবেশ করল। বনের মধ্যে কোথাও তারা সেরকম কোনও গাছ দেখতে পেল না। তখন সবার ভয় কেটে গেল। এভাবে তারা বন পার হয়ে একটি গ্রামের সামনে এসে পড়ল। গ্রামে ঢোকার মুখে সকলের নজরে পড়ল সুন্দর একটি গাছের দিকে। সবুজ কচি পাতাতে গাছটি ভর্তি। তার শাখা থেকে ঝুলছে কতকটা আমের মতো দেখতে পাকা পাকা ফল। বোধিসত্ত্বের সঙ্গের লোকজন আগে এরকম গাছ কখনও দেখেনি। তারা ভাবল বনের ভিতরের গাছগুলি তো বিষফলের গাছ। আমাদের মালিক তো সেই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিল। এগুলি খেতে তো কোনও দোষ নেই। পাকা পাকা ফল দেখে গাড়ি থামিয়ে মনের আনন্দে আর লোভে তাদের কয়েকজন লোক গাছ থেকে পেড়ে সেই ফল খেয়ে ফেলল।

যারা ফল খেয়েছে তারা তো আনন্দে উচ্ছ্বসিত। এত মিষ্টি ফল জীবনে তারা খায়নি। বাকি লোকেরাও খাবার তোড়জোড় করছে দেখে বোধিসত্ত্ব ছুটে এসে বললেন, এটি সেই বিষফলের গাছ, কেউ খাবে না। কিন্তু দেখলেন আগেই কয়েকজন সেই ফল খেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাকিরা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। বোধিসত্ত্ব বললেন, কোনও ভয় নেই। ওষুধ দিচ্ছি, ওরা এখনি সুস্থ হয়ে যাবে। তাদের মুখে ওষুধ পড়ামাত্রই বমি করতে শুরু করল। বমির সঙ্গে সব বিষ বেরিয়ে এল। তারা সুস্থ বোধ করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব সবাইকে বললেন --দেখ, এই গ্রামের লোকজন ভালো নয়। তারা সব লুঠেরা। গ্রামের ঢোকার মুখে এই বিষফলের গাছ লাগিয়ে রেখেছে যাতে বণিকরা এই ফল খেয়ে মারা যায়। তাহলে বণিকদের সব মালপত্র এরা লুঠে নেবে।

সেদিন সকালেও গ্রামবাসীরা বোধিসত্ত্বের মালপত্র লুঠ করতে এসেছিল। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল মারা যাওয়া তো দূরের কথা, একটা লোকও অসুস্থ হয়নি। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে তারা অবাক হলো। তাদের সর্দার এগিয়ে এসে বোধিসত্ত্বের লোকেদের জিজাসা করল, এ ফল খেয়েও তোমরা বেঁচে আছ কী করে? তারা বলল, আমরা আম মনে করে দু'এক জন খেয়েছিলাম। অসুস্থও হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মালিক আমাদের সুস্থ করে তুলেছেন।

গ্রামের লোকেরা বোধিসত্ত্বের কাছে জানতে চাইল, আপনি কীভাবে বুঝলেন এটা বিষফলের গাছ? বোধিসত্ত্ব বললেল, দেখ, গাছভর্তি সুন্দর সুন্দর পাকা ফল দেখে গ্রামের কোনও শিশুও খায়নি, এমনকী পাখিতেও খায়নি। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুবই বদ মতলবে এই বিষফলের গাছটি লাগানো হয়েছে। আর গ্রামে ঢোকার মুখেই লাগানো হয়েছে। তিনি গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা এভাবে মানুষ হত্যা করো না। লুঠতরাজ ছেড়ে কৃষিকাজ করে সৎভাবে জীবন যাপন কর, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন। বোধিসত্ত্বের প্রভাবে গ্রামের লোকেরা লুঠতরাজ ছেড়ে দিয়ে সৎভাবে জীবন যাপন করতে লাগল। ▮

ভারতের পথে পথে

খাজুরাহো

মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো ছিল অতীতের বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের রাজধানী। এই রাজাদের আমলে শতাধিক বছর ধরে নানান রাজার সময়ে ৮৫ টি মন্দির গড়ে ওঠে খাজুরাহোয়। অপূর্ব ছিল সেগুলির শিল্পসুষমাময় কারুকার্য। একাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণে খাজুরাহার বহু মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। জল-জঙ্গলে চাপা পড়ে ছিল ছশো বছর। ১৯২৩ সালে খনন কার্যের ফলে আবার লোকসমক্ষে আসে খাজুরাহোর মন্দিররাজি। নাগরা শৈলীর মন্দির স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই মন্দিরগুলি। পাথর কুঁদে তৈরি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের এই সজীব মূর্তিগুলির তুলনা হয় না। খাজুরাহোর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্যপর্বত। ১৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে মন্দিরগুলি। সারা দিনের সূর্যের কিরণে মন্দিরের মূর্তিগুলির রং বদল হয়, আবার চাঁদের আলোয় সাদা ধবধবে দেখায়। ১৯৮৬ সালে খাজুরাহো ইউনেস্কার ওয়ালর্জ হেরিটেজ সাইট তালিকাভুক্ত হয়েছে।

জানো কি?

বিভিন্ন রাজ্যের প্রচলিত নৃত্য

- পশ্চিমবঙ্গ— ছৌ, যাত্রা, কাঠি, গম্ভীরা, ঢালি, মহল, কীর্তন।
- ওড়িশা— ডালখই, ডান্ডানাটে, ঘুমরা, রণপা, ছাডায়া, ওড়িশি, সাভারি, বাহাকাওয়াটা।
- বিহার— যাতাযতীন, বিদেশিয়া।
- মণিপুর— মহারাসসা, মণিপুরি, কাবুই।
- মিজোরাম— চিরাও, বাঁশনৃত্য, লাম, কুয়াল্লাম, চেরোকান।
- পঞ্জাব— গিড্ডা, ভাঙরা, ধামান। ডাফ।

ভালো কথা

রূপষার চিঠি

আমাদের বাড়িতে স্বস্তিকা পত্রিকা বহুদিন থেকেই আসে। নবাঙ্কুর বিভাগ আমার খুব প্রিয়। প্রতি সংখ্যাতেই আমি এই বিভাগে অংশগ্রহণ করি। লেখা হোয়াটস্অ্যাপে পাঠাই। শব্দের খেলা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাই। কয়েকদিন আগে আমাকে জানানো হয় নবাঙ্কুর বিভাগে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে আমি নির্বাচিত হয়েছি। আমাকে ১৩ এপ্রিল স্বস্তিকা নববর্ষ-১৪২৬ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে উপস্থিত থাকতে হবে। যথারীতি সেদিন আমি বাবা-মা'র সঙ্গে অনুষ্ঠানে হাজির হলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ও আমার মা'কেমঞ্চে ডাকা হলো। মঞ্চে আমার পরিচয় করানোর পর শ্রীমতী মহুয়া ধর উত্তরীয় পরিয়ে সত্যজিৎ রায়ের 'গল্প ১০১' বই ও মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে অভিনন্দন জানালেন ও আশীর্বাদ করলেন। স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সম্মানিত হতে পেরে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এর পর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এতে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি। এই অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে

রূপষা দেবনাথ, নবম শ্রেণী, বিরাটি, কলকাতা-৪৯।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) হ বী সি র	(১) প না ল্প রি পূ ক র্ব
(২) ক্ষা প ভা রী	(২) ত ফ ভা ল ন রা ব

১৫ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) জনসংযোগ (২) বহিঃপ্রকাশ

১৫ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর

(১) চিন্তাভারাক্রান্ত (২) ছায়াসুনিবিড়

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯ (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) টিংকু মণ্ডল, ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) শিবম মাহাত, সুরুলিয়া, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শুধু উন্নয়ন নয়, চাই ভারতীয় সভ্যতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার

সোমনাথ গোস্বামী

২০১৪ সালে প্রথমবার কোনও অ-কংগ্রেসি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে ১৫টি লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ জন প্রধানমন্ত্রী এ দেশে সরকার চালিয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র একজন ভারতীয় জনতা পার্টির। তাঁর আমলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের যে গৌরবগাথা রচিত হয়েছে তা যতদিন ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র থাকবে ততদিন অমলিন থাকবে। তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু তাঁর কাছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না তাই উন্নয়নের উপরে উঠে ভারতীয় সভ্যতার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর বাধ্যবাধকতা ছিল। তা সত্ত্বেও সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা নতুন দিশা পেয়েছে, গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের কয়েক লক্ষ গ্রাম উন্নয়নে নিজেদের প্রথমবার এতটা গুরুত্ব পেতে দেখছে, স্বাধীনতার পর প্রথমবার কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে আইন করে রাজস্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়বদ্ধতা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, পোখরান হয়েছে, কার্গিল হয়েছে এবং সর্বোপরি বিধ্বংসী ভূমিকম্প আর সুনামিতে দেশের একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চলার পরও দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল উর্ধ্বমুখী।

বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত বিজেপি দেশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের পথে অনেকটা এগিয়েছে।

এখানে আমি কয়েকটি উপলব্ধির কথা তুলে ধরবো যা জাতীয় সংবাদমাধ্যম তথা আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমের হয় নজর পড়েনি নয়তো সজ্ঞানে তার ওপর আলোকপাত করা হয়নি।

১। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নের ভিত্তি একদিকে যেমন ছিল জিডিপি নির্ভর উন্নয়ন তেমনি অন্যদিকে ছিল স্বচ্ছ ভারত, হৃদয়, প্রসাদ, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, স্বদেশ দর্শনের মতো প্রকল্প যা ভারতের অধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিকশিত করার প্রচেষ্টা।

২। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি হলো নারীশক্তি। এতদিন সমস্ত রাজনৈতিক দল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে মহিলা সশক্তিকরণের বিষয়টি শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সমাধান করতে চেয়েছে। এই প্রথমবার উজ্জ্বলা, মুদ্রা, তিন তালাক বিরোধী পদক্ষেপের মতো যোজনার মাধ্যমে এই দেশের মহিলাদের বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

৩। গঙ্গা ভারতের সভ্যতার ভিত্তি। নমামি গঙ্গে প্রকল্প নিয়ে সংবাদমাধ্যম যতই নেতিবাচক প্রচার করুক না কেন, গঙ্গাকে কেন্দ্রীয় নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য এবং গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করার জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকার ধন্যবাদের পাত্র।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মর্যাদা নিয়ে যে সব আঞ্চলিক দল আজ মড়াকান্না কাঁদছে, তারা কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের মতো একটি অসাংবিধানিক, চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলা এবং কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সংস্থার দরবারে গিয়ে নিজেদের রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা করতে দিব্যি স্বচ্ছন্দ ছিল। আজ জিএসটি কাউন্সিল তথা নীতি আয়োগের মতো সংস্থা গঠন করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি রাজ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি বসে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়েছে।

৫। কোনও উন্নয়নশীল দেশের ভিত্তি তখনই মজবুত হয় যখন রাষ্ট্র আর তার নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা মজবুত হয়। বিগত পাঁচ বছরে আমাদের দেশ যে বেশ কয়েক কদম এগিয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একদিকে যেমন ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষকে কোনও মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়া আত্মমর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া হয়েছে অন্য দিকে সমস্ত সরকারি কাজে স্ব প্রত্যয়নকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬। স্বল্পস্থায়ী ভোটমুখী উন্নয়ন ছেড়ে দীর্ঘস্থায়ী বুনিয়াদি উন্নয়ন যা বিজেপি সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা বিগত পাঁচ বছরে বারে বারে পরিলক্ষিত হয়েছে। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ভারতীয় রেল।

রেল বাজেটের দিন সংসদ রীতিমতো মাছের বাজারে পরিণত হতো যেখানে প্রতিটি আঞ্চলিক দল নিজের নিজের রাজ্যে রেলের প্রকল্প পাওয়ার জন্য ওয়েলে নেমে হট্টগোল করত, সাংসদদের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত নিজের নিজের এলাকায় নতুন ট্রেনের ঘোষণা করানোর জন্য আর রেলমন্ত্রী নিজের সংসদীয় এলাকা তথা নিজের রাজ্যে জনপ্রিয়তা বাড়ানোর রেলকে অস্ত্র করতো। বছর বছর ভারতীয় রেলের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামোগত স্বাস্থ্য ক্রমশ ভঙ্গুর হতো। বিগত পাঁচ বছর এই চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ভারতীয় রেল তার কৌলিন্য অনেকটাই ফিরে পেয়েছে।

৭। সামরিক ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্ত হলো সেই দেশের সরকার, সামরিক বাহিনী আর নাগরিকদের হৃদয়ে জাতীয়তাবাদের ঢেউ একই তীব্রতায়, এক সঙ্গে আছড়ে পড়ে। বিগত পাঁচ বছরে ভারত এই ঘটনার সাক্ষী বারবার হয়েছে।

৮। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের নাগরিকদের বুনিয়াদি চাহিদা হিসাবে ধরা হতো অন্ন, বাসস্থান, শিক্ষা আর পানীয় জল। মোদী সরকার চাহিদার পরিধিটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষণমুক্ত জ্বালানি এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ এই বুনিয়াদি চাহিদার মধ্যে আনা হয়েছে।

৯। ভারত আর নির্বাক শ্রোতা নয়, বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা সকল উন্নয়নশীল দেশে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক সৌর জোট থেকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সবেতেই ভারত আজ বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।

তাই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আগামীদিনে ভারতীয় সভ্যতার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার হবে এবং ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেওয়ার পথে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যাবে বলে দেশবাসী আশা করেন। ▮

শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে মানুষের ঢল

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম হিন্দুদের কাছে একাধারে ভগবান এবং ভারতীয় জাতিসত্তার অনন্য প্রতীক। রামনবমী শ্রীরামের জন্মতিথি। পুণ্যদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ভক্তদের ঢল নেমেছিল পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্যে এমন কোনও জায়গা সেদিন ছিল না যেখানে প্রিয় শ্রীরামের জন্মদিন পালন করার জন্য হাজার হাজার মানুষ সমবেত হননি। কোথাও শোভাযাত্রা হয়েছে, কোথাও হয়েছে বাইক মিছিল। সারাদিন কেটেছে পুজোয়, প্রার্থনায় আর শোভাযাত্রায়। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষ পথে নেমেছিল। বহু জায়গায় পুলিশ বাধা দিয়েছে। কোথাও কোথাও অনর্থক লাঠিচার্জ করে জনপ্লাবনের গতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। আহত হয়েছেন বহু মানুষ। কিন্তু তাতে হিন্দু অস্মিতা দমে যায়নি। পিছু হটেনি এক পাও। ক্ষতস্থানে রুমাল জড়িয়ে শোভাযাত্রায় এগিয়ে যেতে দেখা গেছে অনেক যুবককে। পশ্চিমবঙ্গের হার্মাদ শাসক হয়তো এর মধ্যে রাজনীতি খুঁজবে। কিন্তু এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। গত কয়েকবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে রামনবমী পালন করছেন। কারণ তারা আবার শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য বাঙ্গলায় ফিরতে চান। যে বাঙ্গলা ছিল শক্তির উপাসক, প্রেমের পূজারি। শেকড়ে ফেরার এই যাত্রায় বাঙ্গালির সহায় শ্রীরাম। এবারের রামনবমী সেই দিনবদলেরই ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

উলুবেড়িয়া

পানাগড়

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২০।।

হেট ক্যাম্পেনারদের চিনে নিন

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রচার করেছিলেন : 'গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না।' যাঁরা, বলা ভালো যে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকেন, তাঁরা খুব ভালোভাবেই জানেন যা রটে, তা কিছুটা তো বটে। মুখ্যমন্ত্রীর গুজব সংক্রান্ত এই প্রচার কৌশল যে তাঁর রাজনীতির ধান্দাসর্বস্ব ফায়দা লুটার অঙ্গমাত্র তার প্রমাণ সরকারি টাকায় যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ওই প্রচার বিপণনে তৃণমূল সাংসদ, পরে দুই অভিনেত্রীও এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট পেয়ে যান। বাকি কলাকুশলীরা তৃণমূলের হয়েই প্রচারে নেমেছেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে গুজব আটকানোর নামে গুজব রটানোর খেলায় কারা মেতেছেন? এদের রাজনৈতিক পরিচয়টা সকলের জানা দরকার। শুধু তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়ে এদের বিচার করলে চলবে না। এরা মূলত বামপন্থী। রাজ্যে বামপন্থার সলিল সমাধি ঘটেছে। এরা তাই তৃণমূলে ঠাঁই নিয়েছেন এবং রাজ্যবাসীকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন। মামুলি কলাকুশলীদের কথা বাদ দিল, অভিনয় তাঁদের জীবিকা। কিন্তু মেঘের আড়ালে মেঘনাদদের চিনতে না পারলে দেশের সমূহ বিপদ, বাঙ্গালিরও।

সম্প্রতি কবীর সুমন নামে এক গায়ক মন্তব্য করেছেন পাগড়ি বাঁধা বিবেকানন্দকে আমরা জাতীয় নায়ক বলে মানব কেন? তার পরিবর্তে তিনি প্রখ্যাত এক ফুটবলারকে জাতীয় নায়ক বলে মানতে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই কিংবদন্তী ফুটবলারকে জাতীয় নায়ক বলে মানা যেতেই পারে। কিন্তু বিবেকানন্দে আপত্তি কেন? কারণ বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা ঘোষণা করেছেন। ওই গায়কটি আদতে একজন ব্রাহ্মণ, নাম সুমন চট্টোপাধ্যায়, পরে মুসলমানে দীক্ষিত হন। আড়ালে আবডালে অনেকে বলে থাকেন বহুবিবাহের জন্যই নাকি এই ধর্মান্তরকরণ। তার সরকারি ভাবে বিবাহের সংখ্যা আপাতত পাঁচ। তৃণমূলের মঞ্চ ব্যবহার করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে সোশ্যাল মিডিয়া হিন্দুধর্ম থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, লাগাতার তার আক্রমণের শিকার। গায়কের মুখোশের আড়ালে ঘৃণা জড়ানোর মূল হোতা এই জঘন্য লোকটি।

আরেকজনের কথা তো এবার বলতেই হবে, তার নাম গর্গ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা পক্ষের ঘৃণিত নেতা, বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের নামে সারা

বিশ্বামিত্রের কলম

ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আরবি আদর্শে উদ্বুদ্ধ বাংলাস্তান গড়াই এই লোকটির মূল

অ্যাজেন্ডা। বাঙ্গালি বাদে ভারতবাসী মাত্রই এই বাংলা পক্ষের কাছে গুটকাখোর এবং এই গুটকাখোরদের প্রতিনিধি বিজেপি। বিজেপিকে রুখতে তাই এরা তৃণমূলের শরণাপন্ন। ফলে এদের চিনতে কোনও অসুবিধে নেই। ভারতজুড়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার বড়ো ফেরিওয়ালা এরা। এদের স্লোগান : 'আমরা হিন্দু নই, আমরা বাঙ্গালি।' এই স্লোগানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ইসলামের প্রতি এদের নীরব আনুগত্য। শোনা যায়, বাংলাদেশের জামাত গোষ্ঠীর সঙ্গেও এদের সংযোগ রয়েছে।

রাজাবাজারের মোড়ে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোমাংস ভক্ষণকারী সুবোধ কবির ছবি আমরা সবাই দেখেছি। শিবের ত্রিশূলে কন্ডোম পরানো-খ্যাত কবি শ্রীজাত-র সেকুলার ভাবমূর্তি, কবিতা পড়তে গিয়ে বিজেপি শাসিত অসমের শিলচরে কবির আক্রান্ত হওয়ায় সারা বাংলা গর্জে ওঠো ডাকে আকুলি-বিকুলি করা চিত্রও তো রাজ্যবাসী ভোলেনি। সেই কন্ডোম কবি এখন তৃণমূলের বেনামি মঞ্চ থেকে 'সেকুলারিজম' বাঁচানোর দায়ে বিজেপিকে গাল পাড়ছেন। পাঠক বুঝলেন কিছু? বাজারি মিডিয়াতেও 'হুতোম' সাজতে আগ্রহী এই গায়ক টাইপের লেখক আছে। তার ব্যান্ডের গান আপাতত লাটে উঠেছে, তাই বিদ্রূপ-বক্তৃতার নামে তৃণমূলের অনুগামী বাজারি মিডিয়া চ্যানেলের মঞ্চ মাতাচ্ছেন। আর লোক হাসাচ্ছেন।

এরকম উদাহরণ অজস্র। মাথায় রাখবেন, এই শ্রেণীর লোকগুলো আর তাদের অনুগামীদের রাজনৈতিক বক্তব্য বলে কিছু নেই। যেটা আছে সেটা হলো বিজেপি বিরোধিতার মুখোশের আড়ালে অন্ধ দেশদ্রোহিতা, আর বুদ্ধিজীবী তকমার সুযোগ নিয়ে বাঙ্গালিকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা, বলা ভালো বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের নামে বাংলাদেশের আরবি সংস্কৃতিকে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এর জন্য ঘৃণার যে বিষবাষ্প ছড়াতে হয় তা এরা ভালোভাবেই জানে। এই ঘৃণার কারবারের কথা বলব আগামী সংখ্যায়। ■

দিদি বলেছেন, দিদিই প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোট কেউ কেউ দিয়ে ফেলেছেন। কেউ কেউ দেবেন। কিন্তু মনে রাখবেন দিদিই প্রধানমন্ত্রী। ভোট দিতে যাওয়ার আগে তাঁর কথা একটু ভাববেন। দিদি বদলেছেন। আগে তিনি নির্বাচন কমিশনে ভরসা করতেন। এখন করেন না। দিদিই ঠিক। তার উপরে কিছুই নেই। তাই দিদির কথা ভুলে গেলে চলবে না। গাঁয়ে মানুক আর নাই মানুক দিদি বলেছেন তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। অতএব হবেন। আর কোনও কথা হবে না। আপনি যাঁকে খুশি ভোট দিন দিদিই প্রধানমন্ত্রী।

রাজ্যকে 'অন্ধকারে' রেখে দিল্লি থেকে লোক পাঠিয়ে বাংলায় সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা চলছে। নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য করে এ ভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ''বাংলায় যারা সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে, আমরা তার বদলা নেব। আগে দিল্লি থেকে ওদের তাড়াই।'' দিদি বদলের স্লোগান ছেড়ে বদলার কথা বলছেন। এটাই তো পরিবর্তন। আসুন আমরা দিদির পাশে দাঁড়াই।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে ১০-১৫ বছর আগের বিহারের তুলনা করেছেন। সেই রাতেই তার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ওই অফিসারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কমিশনকে চিঠি লেখে তৃণমূল মানে দিদি। তিনি একটি সভায় বলেন, ''দিল্লি থেকে দুটো লোক পাঠিয়ে সরকার চালাচ্ছেন। তাঁরা রাজ্যের সব অফিসার বদলে দিচ্ছেন। চেষ্টা করছেন বিজেপিকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়। এটা অসাংবিধানিক। রাজনৈতিক কথা বলছেন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারেরা (উল্লেখ্য অজয় নায়েকও অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস)। গালাগালি দিচ্ছেন। বাংলা এসব গালাগাল সহ্য করে না।'' না, বাংলা সহ্য করে না। বাংলা শুধু দিদিকেই সহ্য করে, করবে।

দিদি আরও বলেছেন, ''রাজ্যে একটা নির্বাচিত সরকার আছে। আপনারা ভোট দিয়ে আমাদের নির্বাচন করেছেন। রাজ্য সরকারকে বাদ দিয়ে দিল্লি থেকে লোক পাঠিয়ে সমান্তরাল একটা সরকার চালানোর চেষ্টা করছে। এটা অসাংবিধানিক অগণতান্ত্রিক।'' হ্যাঁ, দিদির কাছেই গণতন্ত্র শিখতে হবে। পুরনো পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা একদম ভাববেন না। ওটাও গণতন্ত্রই ছিল। গণতন্ত্রে ভোটে বাধা দেওয়া, মনোনয়ন না দিতে দেওয়া সব করা যায়। দিদি যখন বলেছেন যায় তো যায়। কোনও কথা হবে না।

দিদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন, ''দিল্লি থেকে পাঁচ কোটি পুলিশ আনলেও বাংলায় বিজেপি গোল্লা পাবে।'' অঙ্ক কষে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন, দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই বিজেপির ফল ভালো হবে না। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, কংগ্রেসও একক শক্তিতে সরকার গড়তে পারবে না। আগামীদিনে সরকার গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আঞ্চলিক দলগুলি। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বেই সরকার হবে।

কী করে হবে ভাবছেন! আপনার সাহস তো কম নয়। দিদি কিন্তু বদলা নেবেন বলেছেন।

দিদির নামে কুৎসা করেও কোনও লাভ নেই। 'কুৎসা' এখন আর স্পর্শ করে না তাঁকে। একটি নির্বাচনী সভায় এই মন্তব্য করেছেন দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, ''এ সব শুনলে ছোটোবেলায় কষ্ট হত। এখন চোর বললেও আমার কিছু যায় আসে না।

আমি এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছি।'' সারদা, নারদা, রোজভ্যালি, ছবি বিক্রি এসব নিয়ে তাই কথা বলে লাভ নেই। দিদি এসবের অনেক উপরে। তাঁর বক্তব্য, ''আমাকে চোর বলে বলুক। অনেক কুৎসা শুনেছি।''

দিদির সংসার কী করে চলে জানেন! জানেন না তো! জেনে নিন। দিদি ভোটের প্রচারে বলছেন, ''আমার কী করে চলে? চুরি ডাকাতি থেকে নয়। লেখা ৮৭ টা বই আছে। চল্লিশ টাকা বিক্রি হলে আমি চার টাকা রয়্যালটি পাই। আর গানের সুর দিয়ে যা পাই তা দিয়ে আমার চলে যায়।''

সুতরাং, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে দিদির বই পড়ুন। কানে হেডফোন লাগিয়ে দিদির গান শুনুন। দিদির কবিতা আবৃত্তি করতে করতে যাঁকে খুশি ভোট দিয়ে আসুন। প্রধানমন্ত্রী তবু দিদিই হবেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

এবারের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপরই দিল্লির ক্ষমতার চাবিকাটি থাকতে পারে

অতিথি কলম

নলিন মেহতা

প্রখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান রাজনৈতিক গবেষক স্টুয়ার্ট ম্যাককারথার ১১৭১ সালে তাঁর নতুন চিন্তা সংবলিত Universal Corrective map-এর নিবন্ধ প্রকাশ করার পর নির্বাচনী হিসেব নিকেশে নাড়াচাড়া দেখা দেয়। তিনি বিশ্বের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত দেশগুলিকে উত্তরের দিকে কাল্পনিকভাবে স্থাপন করেন ও উত্তরের গুলিকে তার নীচে অর্থাৎ দক্ষিণে স্থাপন করে দেখান। এই নতুন উপস্থাপন ফের নিজেদের অজান্তেই এই ভৌগোলিক দিক পরিবর্তন কীভাবে আমাদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়টি নিয়ে চর্চায় জড়িয়ে দেয়। উত্তর ভারতের চিরাচরিত হিন্দিভাষী অঞ্চলই ভারতের কেন্দ্রীয় রাজনীতির নিয়ামকের ভূমিকায় থাকে। পুরনো রাজনৈতিক প্রবাদ অনুযায়ী 'দিল্লির পথ লক্ষ্ণৌ হয়েই যেতে হয়' এমনটাই প্রচলিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মানচিত্রটিকে উলটো করে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে চলতি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চিত্রটা বদলে যাবে। যেখানে আলি-বজরঙ্গবালি, হিন্দু সন্ত্রাস, জাতীয়তাবাদী-দেশদ্রোহীর মতো শোরগোল তোলা তুমুল বিতর্কিত বিষয়ের কলরোল আদৌ শোনা যাবে না। মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে বিন্ধ্যপর্বত।

১৯৮৯ সালে জোট সরকারের উত্থান শুরু হওয়ার পর থেকেই দক্ষিণের রাজ্যগুলির দিল্লিতে এ বিষয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ২০০৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতা হারানোর মূলেই ছিল বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণের জোটসঙ্গী AIADMK ও TDP-র জোট পরিত্যাগ করা। ২০১৪ সালে এই ঐতিহাসিক দক্ষিণী প্রবণতাকে লাগাম পরায় বিধ্বংসী মোদীঝড়। বরাবরের জাতপাতের রাজনীতির সমীকরণ ছিন্ন করে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয় ও পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে বিজেপির বিপুল জয় হয়। ২০১৪ সালের বিপুল জয়ের মধ্যে কিন্তু সুপ্ত ছিল আরও একটি হিসেব। আলোচনার খাতিরে ও বাস্তবতার নিরিখে এগুলি আলোচনা করলে ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণের সুবিধে হয়। দলের জয়ে মূল ভূমিকা ছিল দেশের ১৯টি রাজ্যের মধ্যে ১২ টির (এর মধ্যে ১০টি মূল হিন্দি বলয়ে ও দুটি দক্ষিণ ভারতে)। মনে রাখতে হবে, এই জয়ের মধ্যেই ছিল দলের প্রাপ্ত আসনের ৮৫ শতাংশ। তাই, ২০১৯ সালে যদি বিজেপি হিন্দি বলয়ে তার ২০১৪ সালের সাফল্য সীমা ছুঁতে না পারে তখনই আবার দক্ষিণের বড় বড় রাজ্যগুলি তাদের অতীতের দিল্লিতে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় চলে যেতে পারে। বলা বাহুল্য, দক্ষিণের আঞ্চলিক দলগুলির নির্বাচনী সাফল্য সেক্ষেত্রে দিল্লিতে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে চমৎকার ঘটানার ক্ষমতা ধরবে। আঞ্চলিকতা ভিত্তিক দলের তকমা অজান্তেই খসে যাবে। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গনা, কেরালা, কর্ণাটক ও পুদুচেরীর মতো কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল নিয়ে আসন সংখ্যা মোট ১৩০টি। সংসদে মোট আসনের ১ পঞ্চামাংশ থেকে এই সংখ্যা বেশি (মোট আসন ৫৪৩)। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে উত্তর দক্ষিণের তুমুল বৈপরীত্যকে প্রকট করে দিয়ে দক্ষিণে বিজেপি জিতেছিল মাত্র ১৫ শতাংশ আসন যা আবার দলের মোট জেতা আসনের ছিল মাত্র ৭ শতাংশ। এখন এই পরিসংখ্যানের প্রেক্ষাপটে ২০১৯ সালে দল কতটা সাফল্য আশা করতে পারে?

> যদি দিল্লির ক্ষমতা দখল কোনো একটি প্রধান প্রতিষ্ঠিত জোটের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে অর্থাৎ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অধরা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই দক্ষিণী দলগুলি আবার তাদের পূর্ণ অতীত গরিমায় ফিরে আসবে। জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ জোটসঙ্গীর ভূমিকা নেবে।

২০১৪-র নির্বাচনে তামিলনাড়ুর ৩৯ টি আসনের মধ্যে AIADMK তৎকালীন জয়ললিতার জীবদ্দশায় ৩৭টি আসন জিতেছিল। জয়ললিতা মারা যাওয়ার পর দল কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। ওদিকে DMK প্রধান করুণানিধিরও ইতিমধ্যে

দেহাবসান হয়েছে। সুতরাং এই রাজ্যের রাজনীতি এখন যুগসন্ধিক্ষণে। এই নির্বাচনে AIADMK লড়ছে মাত্র ২০টি আসনে, ৫টি তারা দিয়েছে বিজেপিকে। বাকি আসনগুলিতে লড়াই করছে NDA ভুক্ত অন্যান্য দক্ষিণী ছোট দল। এটি এমন একটি রাজ্য যেখানে দ্রাবিড় আত্মগরিমায় নাগরিকরা সদা সচেতন। রাজনৈতিক দক্ষতার আবার পালা করে নিয়মমাফিক বদল হয়ে থাকে। এখানে তাই NDA-র দুটি প্রধান সমস্যা আছে। প্রথমত DMK যে খুব মনোহারী স্লোগান তুলেছে AIADMK দিল্লির অঙ্গুলিহেলনে চলছে তা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে। ভোটের দু'দিন আগে কানিমোঝির বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানার কোনও প্রভাব এই সূত্রে পড়েনি।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি মারাত্মক। AIADMK-কে কড়া মোকাবিলার মুখে ফেলেছে দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া দিনকরণের AMMK-এর নবগঠিত দল। এরা ৩৮ জন বিদ্রোহী প্রতিদ্বন্দীকে বিভিন্ন আসনে প্রার্থী করেছে। বিরল চরিত্র জয়ললিতার ভোটাররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। NDA অবশ্যই এক্ষেত্রে জাতিগত সমীকরণের ওপরই বেশি ভরসা রাখছে। বিশেষ করে উত্তর তামিলনাড়ুতে। যেখানে জোটসঙ্গী DMK-এর একটা শক্তপোক্ত বানিয়া ভোটদাতার পুঁজি রয়েছে। সেই সুবাদে ধর্মপুরী, ভিল্লুপুরম, ভেলোর, কুদালর বা তিরুভাল্লামাল্লীর মতো আসন NDA দলের প্রত্যাশী। এছাড়া বিজেপির ভাগে থাকা ৫টির মধ্যে চারটিতে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। গত নির্বাচনে তামিলনাড়ুর একমাত্র আসন কন্যাকুমারী থেকে বিজেপি জয় পেয়েছিল। এবারে কুটিকোরিন, শিবগঙ্গা, কোয়েম্বাটুর, রামনাথপুরমে তারা লড়াইয়ে আছে। এর মধ্যে কর্ণাটক রাজ্যটিতে কিন্তু বিগত তিনটি লোকসভা নির্বাচনেই বিজেপি ক্রমিক সাফল্য পেয়ে এসেছে। রাজ্যের ২৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে বিজেপি ২০০৪-এ ১৮টি, ২০০৯-এ ১৯টি ও ২০১৪-তে ১৭টি আসনে জিতে দীর্ঘ সফলতার নজির রেখেছে। অন্যদিকে ২০১৮ সালের রাজ্য নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবেও উঠে এসেছে।

অন্যদিকে কেরলের ওয়ানাড থেকে রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী ময়দানে নামা কংগ্রেস দলের সেই পুরনো দক্ষিণী আধিপত্য পুনরুদ্ধারের নবতম প্রয়াস। নজর করলে দেখা যাবে অন্য আর পাঁচটা রাজ্যের থেকে কেরলে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্যের চ্যালেঞ্জ কতটা কঠিন। এক আধটা নয় লোকসভার লড়াইয়ে কংগ্রেস২০টির মধ্যে সিপিএম-এর সঙ্গে ১২টি কেন্দ্রে সরাসরি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। বিজেপি কমপক্ষে তিনটি আসন জয়ের কথা ভাবছে। এর মধ্যে শবরীমালা মন্দির যেখানে অবস্থিত সেই 'পাথানাখিট্টা' আসন, তিরুবনন্তপুরম অর্থাৎ রাজধানী শহর যেখানে ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে তারা কংগ্রেসের দমদার প্রার্থী শশী থারুরের ঠিক পেছনেই ছিল। এছাড়া চালাকুডি আসনটি দলের হিসেবের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে ২০১৪ সালের নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে বিজেপি ২১টি আসন জিতেছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তর ভারতে দলের ১৪ সালের বিপুল জয়ের পুনরাবৃত্তি না হয়ে কিছু আসনের যে সম্ভাব্য ক্ষতি ধরে নেওয়া হচ্ছে তা দক্ষিণে অন্তত প্রান্তিক উন্নতি মেটাতে পারলেও কিছুটা তো পুরণ হবেই। হ্যাঁ, উত্তর ভারতে এনডিএ-র তুলনায় দক্ষিণে ইউপিএ-র পরিস্থিতি সামান্য হলেও কিছুটা ভালো। তবে নিজেদের অতীত শক্তিস্থল তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে নিরঙ্কুশ আধিপত্য হারানোর পর সেই ফারাক নগণ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি দিল্লির ক্ষমতা দখল কোনো একটি প্রধান প্রতিষ্ঠিত জোটের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে অর্থাৎ নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অধরা থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই দক্ষিণী দলগুলি আবার তাদের পূর্ণ অতীত গরিমায় ফিরে আসবে। জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ জোটসঙ্গীর ভূমিকা নেবে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

উপ রাষ্ট্রপতির বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ক্ষোভ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী হামলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ বিশ্ব সংস্থাগুলির কাছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে সার্বিক নীতি প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা দ্রুতসম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে এই সার্বিক নীতির প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে অপরাধমূলক প্রয়াস হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাদের অর্থ, অস্ত্র এবং নিরাপদ আশ্রয়দান নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তিনি সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ বিশ্ব থেকে মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে সমবেত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২২ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪তম বার্ষিক সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী নাইডু বলেন, রাষ্ট্র-নীতির অঙ্গ হিসাবে যারা সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ দেয় এবং সহায়তা করে তাদের বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে অমানবিক সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে সমবেত উদ্যোগ নেওয়ার সময় এসেছে। শুধুমাত্র সন্ত্রাসের নিন্দা করলেই চলবে না, সমস্ত ধরনের সন্ত্রাসকে শেকড় সহ উপড়ে ফেলতে হবে। সারা বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ সন্ত্রাসের বলি হচ্ছেন, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে উন্নয়ন নিরর্থক হয়ে ওঠে। শ্রীলঙ্কায় বর্বর সন্ত্রাসবাদী হামলায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্রী নাইডু বলেন, সঙ্কটের এই মুহূর্তে ভারত, শ্রীলঙ্কা সরকার এবং সেদেশের মানুষের পাশে আছে। শিক্ষা প্রসঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন যে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে উচ্চ শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সামাজিক ও লিঙ্গ সমতার নীতিকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা তিনি বলেন। বর্তমান সময়ে বিশ্বমানের উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে শ্রী নাইডু মন্তব্য করেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশনের মতে উদ্যোগের মাধ্যমে অনলাইন পাঠ্যক্রমকে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে তিনি উভয়মুখী আলোচনা-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়ার কথাও বলেন।

বসুন্ধরা দিবসে সবুজায়নের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রত্যেক বছর ২২ এপ্রিল দিনটি সারা বিশ্বে বসুন্ধরা দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। ১৯৭০ সালে আধুনিক পরিবেশ সম্পর্কিত যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার স্মরণেই এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিদিনই মানুষের আচরণে যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং নীতিগত পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে, পৃথিবীর ওপর তার প্রভাব রুখতেই এই দিবস পালন করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী তার ক্যান্টনমেন্ট এবং ঘাঁটিতে সবুজায়নের লক্ষ্যে সবসময় কাজ করে চলেছে। এ বছর পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কম্যান্ডের প্রধান কার্যালয় ফোর্ট উইলিয়াম ও তার সংলগ্ন এলাকায় 'গো গ্রিন' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যজুড়ে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ এবং বিদ্যাভারতীর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকারা এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। প্লাস্টিক ও থার্মোকল বর্জন বিষয়ে তারা সমাজ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে। এই উপলক্ষ্যে গাছ লাগানো, সচেতনতামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা, ম্যুরাল পেইন্টিং-এর মতো বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কম্যান্ডের প্রধান কার্যালয় শক্তি সঞ্চয়ের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব হবে। একইসঙ্গে ১০০ শতাংশ জল সংরক্ষণের ওপরও জোর বিশেষ জোর দিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামে একটি 'অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেম' বসানো হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কম্যান্ড তাদের এই উদ্যোগে অন্যান্যদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসাবে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে কলকাতার ময়দান এলাকার ৭২টি ক্লাবকে সামিল করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে গত ২১ এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়াম স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে এক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে ৭২টি ক্লাব-সহ সাধারণ মানুষ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা সবুজায়ন এবং পরিচ্ছন্নতার শপথ নেন।

সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে : বেঙ্কাইয়া নাইডু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে ছাত্র-ছাত্রী ও নবীন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি তাদের মেধাকেও কাজে লাগানোর পরামর্শ দিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। শ্রী নাইডু ২৩ এপ্রিল অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুর জেলায় শ্রী সিটিতে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যুবসমাজের উদ্দেশে বলেন, বর্তমান সময়ের একাধিক জ্বলন্ত সমস্যা, যেমন—দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুধা, শহর-গ্রামাঞ্চল বৈষম্য প্রভৃতির সমাধানে ইতিবাচক অবদান রাখতে হবে। পড়ুয়াদেরকে নিজস্ব মাপকাঠি প্রণয়ন করে আন্তরিকতা, শিষ্টাচার এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের পরামর্শ দিয়ে উপরাষ্ট্রপতি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদেরকে সজাগ

থাকতে হবে। একই সঙ্গে, সাফল্যের ব্যাপারে আত্মসন্তুষ্টিতে না ভুগে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে আরও দায়বদ্ধ হতে হবে। আই আইটি, আই আই এম, আই এস বি'র মতো উচ্চশিক্ষা তথা উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের পড়ুয়াদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করে শ্রী নাইডু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহকে আরও বাড়াতে সম্পূর্ণ শিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেন। শ্রী সিটি'র ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির মতো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আদর্শ উৎকর্ষ কেন্দ্র হয়ে ওঠার কথাও তিনি বলেন।

তওহিদ জামাতের পিছনে কি সোনিয়া-মনমোহন?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল তওহিদ জামাতের নাম এখন সবাই জানেন। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় যে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয়েছে তার রূপকার এই ন্যাশনাল তওহিদ জামাত। তামিলনাড়ুতে তওহিদ জামাত বলে একটি সংগঠন রয়েছে। জঙ্গি হামলার প্রাথমিক তদন্তের পর গোয়েন্দারা মনে করছেন শ্রীলঙ্কায় ন্যাশনাল তওহিদ জামাত এবং তামিলনাড়ুর তওহিদ জামাত একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ এবং একই আদর্শে বিশ্বাসী সংগঠন। যদিও তামিলনাড়ুর সংগঠনটির তরফ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর তওহিদ জামাতের সাধারণ সম্পাদক ই-মহম্মদ জানান, তাদের সংগঠন রক্তদান শিবির আয়োজন, গরিবদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের মতো সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু গোল বেঁধেছে শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল তওহিদের ব্যাখ্যায়। তাদের বক্তব্য, তারা তামিলনাড়ুর তওহিদের সঙ্গে মিলেজুলেই সব কাজ করে। অর্থাৎ তামিলনাড়ুর তওহিদের ভূমিকা বড়োভাইয়ের মতো। ইসলামিক স্টেটের পরামর্শ অনুযায়ী তারা হামলার রূপরেখা তৈরি করে এবং শ্রীলঙ্কার সংগঠনটি তা মেনে চলে। পুলিশ সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে তামিলনাড়ুর তওহিদ জামাতের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ ওঠে। পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করা হয়। পুলিশের বক্তব্য, সংগঠনটি সমাজসেবার আড়ালে জঙ্গি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তবে এ বিষয়ে আরও তদন্তের প্রয়োজন আছে।

এদিকে অন্য একটি প্রসঙ্গ তওহিদ কাণ্ডকে আরও জটিল করে তুলেছে। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ চালু করার জন্য তামিলনাড়ুর তওহিদ জামাত অনেকদিন ধরেই আন্দোলন করছে। ২০১০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী মুসলমানদের সংরক্ষণের বিষয়ে কথা বলার জন্য তওহিদের নেতাদের ডেকে পাঠান। সেই সময়ের মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সোনিয়াদের সঙ্গে বৈঠকের কিছু আগে তওহিদের নেতারা এক বিশাল মুসলমান সমাবেশ করেছিলেন চেন্নাইয়ে। তামিলনাড়ুর মুসলমানদের ওপর তওহিদের প্রভাব দেখে সোনিয়া ও মনমোহন তড়িঘড়ি তাদের নেতাদের ডেকে পাঠান। বৈঠকের পর মনমোহন সিংহ কথা দেন তওহিদ নেতাদের দাবি পূরণের সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এখন প্রশ্ন হলো, বহু ইসলামিক সংগঠন মুসলমান সমাবেশের আয়োজন করে মুসলমানদের সংরক্ষণের দাবি তোলেন। তাদের সকলের সঙ্গে সরকার কথাও বলে না, দাবিদাওয়া মেনেও নেয় না। তাহলে তওহিদ জামাতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো কেন? পুলিশ তদন্তে এই প্রশ্নটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রম্যরচনা

প্রতিশ্রুতির বন্যা

রাতে মশা তার স্ত্রীকে বলছে— ডার্লিং, আমি কাল তোমার জন্য বাঘ শিকার করে নিয়ে আসবো।

স্ত্রী ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলছে— ঠিক আছে, এখন শুয়ে পড়।

মশা আবার বলছে— আমি কাল প্যারিস যাবো, সেখানে তোমাকে মারসিডিস গাড়ি চড়াবো।

স্ত্রী ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলছে— ঠিক আছে, এখন শুয়ে পড়, ডার্লিং।

মশা আবারও বলছে— তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছো না, কাল আমি তোমাকে তিন ভরি সোনার চেন বানিয়ে দেব।

স্ত্রী মশা রাগে বিরক্ত হয়ে বলছে— You Idiot, now go to sleep কতবার বলেছি ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের কামড়ে ঘরে এসো না। প্রতিশ্রুতির বন্যায় পুরো ঘর ভেসে যাবে।

উবাচ

"ভেবেচিন্তে নয়, রাজনৈতিক প্রচারে উত্তেজনার বশে বলে ফেলেছিলাম। সুপ্রিমকোর্টকে কোনওভাবেই রাজনীতির মধ্যে আনতে চাই না।"

রাহুল গান্ধী
কংগ্রেস সভাপতি

রাফাল ইস্যুতে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' মন্তব্যের জন্য দুঃখ স্বীকার করে হলফনামা রাহুল গান্ধীর

"অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে অসমের মতো সারা দেশে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে খুঁজে খুঁজে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে বিজেপি।"

অমিত শাহ
বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি

উলুবেরিয়ায় নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে

"এখন সন্ত্রাসবাদীরা জানে, দেশের কোথাও যদি বোমাবাজি হয়, তবে মোদী তাদের পাতাল থেকে খুঁজে এনেও সাজা দেবেন।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

মহারাষ্ট্রের দিনদোরিতে নির্বাচনী বক্তব্যে

"আমাকে যদি আপনাদের পছন্দ না হয় তবে বিজেপিকে ভোট দিন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে একটিও ভোট নয়।"

নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে

আবু হাসেম খান চৌধুরী
মালদার কংগ্রেস নেতা

"পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডাগিরির সরকার চালাচ্ছেন মমতাদিদি। এখানে মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই।"

পশ্চিমবঙ্গে এসে নির্বাচনী ভাষণে

যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশ

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

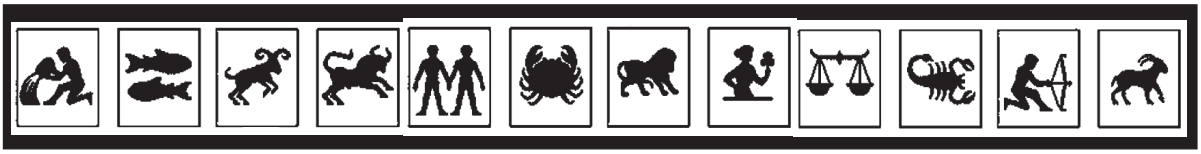

২৯ এপ্রিল (সোমবার) থেকে ৫ মে (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি, বৃষে মঙ্গল, মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, কেতু, মীনে বুধ-শুক্র। ৩ মে, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪২ মিনিটে বুধের মীনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে শতভিষা নক্ষত্র থেকে মেষে ভরণী নক্ষত্রে।

মেষ ঃ জ্ঞান, পরাক্রম, তেজস্বী, আধিপত্য, বস্ত্র-বাহন, ভূমিলাভ নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার্থী, গবেষকদের শংসা ও স্বীকৃতি। প্রেমানন্দে প্লাবিত মন। ব্যবসা ও আর্থিক উপার্জনে মন্থর গতি। ভ্রমণের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। জীবনসঙ্গীর শুভ কর্মপরিকল্পনা ও সম্মান। হঠাৎ অসুস্থতা যোগ।

বৃষ ঃ স্বজন সম্পর্কের উন্নতি, গৃহে শুভ অনুষ্ঠানে অভ্যাগত সমাগম। কীর্তি, যশস্বী, গৃহ ও মাতৃসুখ, বিদ্যা ও কর্মে সাফল্য। পেশাদার জীবনে একাধিক শুভ যোগ ও নতুন আঙ্গিকে ব্যবসা পরিকল্পনার ইতিবাচক ফল। বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদের নব উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব।

মিথুন ঃ চিন্তা চেতনায় দোদুল্যমানতা, অতৃপ্তভাব ছায়াসঙ্গী শরীরের যত্নের প্রয়োজন। স্বজন বান্ধব-সহ শুভ অনুষ্ঠানে সদ্ভাবনা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃত মন। অভিনয়, সঙ্গীত, কাব্য, কলা ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও দক্ষতার বহুমুখী প্রকাশ। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতায় আর্থিক গতি ত্বরান্বিত হবে। বিরোধীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

কর্কট ঃ ভূমিলাভ, পদোন্নতি, তীর্থদর্শন, ধর্মানুষ্ঠান, ঐশ্বরিক বিশ্বাসে ভরপুর মন। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট আঘাত। মাতুলস্থানীয় কারও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। শিক্ষক, অধ্যাপক, গণিতজ্ঞ, বিচারপতির কর্ম নৈপুণ্য ও মানব বেদনার প্রতি অরর সহানুভূতি।

সিংহ ঃ ইনভেস্টমেন্ট থেকে লাভজনক প্রাপ্তি তবে খরচের মাত্রাতিরিক্ত। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে জটিল সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ। প্রেম-প্রণয় ও পত্নীরূপের সার্থক প্রয়াস। সন্তানের কর্মযোগ অথবা বিশেষ সাফল্যে আনন্দ ও গর্ব। মাথা, পেট ও দাঁতের চিকিৎসার প্রয়োজন।

কন্যা ঃ তৃতীয় কারও ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে জটিলতা ও মানসিক অস্থিরতা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখা শ্রেয়। চিন্তা-ভাবনায় দোলাচল, কৌশলীমন ও রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। প্রশাসনিক রদবদল ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা। আইনঘটিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

তুলা ঃ পূর্ব নির্ধারিত সময়েই শুভ কর্মের সূচনা। স্বীয় প্রতিভায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি-সম্মান ও আর্থিক প্রগতি। সরকারি, অথবা পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্তি যোগ। নির্দিষ্ট বিচারধারা ও সাহিত্যানুরাগী মনোভাবে জনপ্রিয়তা ও প্রগতির প্রশস্থ পথ।

বৃশ্চিক ঃ সততা, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা। অন্যের অবিধিপূর্বক আচরণে বিতর্ক ও স্বীয় মতামতের সমর্থন হ্রাস। অধস্তন কর্মচারীদের চাল-চলনে শান্ত ও সংযত থাকুন। কারিগরি কুশলতায় একাধিক পন্থায় উপার্জনের যোগ। সপ্তাহের শেষভাগে অনুকূল পরিবেশে সার্বিক অগ্রগতি ও মানসিক প্রশান্তি।

ধনু ঃ প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস ও চিন্তার স্বচ্ছতায় ব্যবসা ও কর্মে সাফল্য, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান, মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। বহুজনকে খুশি করতে নিজ আদর্শচ্যুতি। অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবারে অসুস্থতার সংখ্যাধিক্য তবে বিদ্যার্থীদের সার্বিক অনুকূল সপ্তাহ।

মকর ঃ চালচলনে সতর্ক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির চাপে ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্বেগ। শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত। উত্তেজক কথাবার্তা ও রমণীর সান্নিধ্য এড়িয়ে চলুন। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি বৃদ্ধি। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা দূর হবে। বেকারদের নতুন কর্মসংস্থানের যোগ।

কুম্ভ ঃ শিষ্টাচার, সৌজন্য, উদারতা, শিল্পনিপুণতা, স্নেহশীলতা ও দরদি মানসিকতায় আপোশহীন মানবপ্রেমী। মেধাবী ছাত্র, আদর্শ পিতা, প্রিয় স্বামী। মেধা ও দক্ষতার মেলবন্ধনে গৃহসুখ। ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আভিজাত্য গৌরব। পতনজনিত আঘাত, ত্বকের রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

মীন ঃ কর্মক্ষেত্রে নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকলেও সতর্কতার প্রয়োজন। অন্তজ শ্রেণীর সহায়তা ও সমাজকল্যাণে ভরপুর মন। মাতার স্বাস্থ্য ও আত্মীয় পরিজনের কারণে মানসিক উদ্বেগ। ব্যবসায় সাফল্যে অগ্রজের ভূমিকা স্মরণীয়। বিদ্যার্থীদের প্রতিযোগিতা ও গবেষণায় অনায়াস সাফল্য। কর্মের যোগসূত্রে প্রেমের পূর্ণতা।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য